স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভূমিকাঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ সেশন সমাজবিজ্ঞানে এম.ফিল ডিগ্রির আংশিক শর্ত পূরনের নিমিত্তে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

জাহানারা কলি

এম.ফিল গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ১১১

শিক্ষাবর্ষ- ২০১৩-১৪

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০১৮

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভূমিকাঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনায়

জাহানারা কলি
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ১১১
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৩-১৪
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভূমিকাঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা শীর্ষক গবেষণাটি আমার নিজস্ব মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে অন্য কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য রচিত হয়েছে। এর সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

জাহানারা কলি
এমফিল গবেষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশবিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভূমিকাঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা শীর্ষক এই গবেষণাপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৩-১৪ সেশনে সমাজবিজ্ঞান এম.ফিল ডিগ্রির আংশিক শর্ত পূরণের নিমিত্তে উত্থাপন করার জন্য রচিত। আমার জানামতে, এই গবেষণাপত্রটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম যেটি গবেষক এককভাবে সম্পন্ন করেছেন। গবেষণাপত্রটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গবেষক সম্পন্ন করলেও এটির খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে দেখেছি ও ভুল সংশোধন করে দিয়েছি। আমার নির্দেশনা অনুযায়ী গবেষক পয়োজনীয় সংশোধনের পর গবেষণাপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে, সমাজবিজ্ঞানে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উত্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে নারীর সমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় নারী উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা। জাতির জনকের হাত ধরেই বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে উন্নতির জন্য বাংলাদেশ অনেক সংগ্রাম করে আসছে। এদেশের মানুষ পরাধীনতার শৃংখলা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপ করে আসছে ৪৭ বছর থেকে। দেশের অবকাঠামোর সাথে মেধা ও মননের উন্নয়নে নারী ও পুরুষ সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারীদের বর্তমান অবস্থার পেছনের ইতিহাস ঘাটলে নিমিষেই উপলব্ধি করা যায় আবদ্ধ নারীকে কতোটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে আসতে হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি মূলত স্বাধীনতার পর থেকে নারীদের এই অগ্রসরমান অবস্থার জন্য বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার অবদানকে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাধীনতার পর থেকেই কাজ করে আসছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের আবাসন ব্যবস্থা করা, কম্পিউটারে দক্ষ করে তোলা, স্বাস্থ্য কমপে-ক্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, তথ্য আপার মাধ্যমে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, আবাসন ও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ব্যবস্থা করা, উপজেলা কমপে-ক্সসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী উন্নয়নের জন্য বেশ উঠে পড়ে লেগেছেন। এই গবেষণায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবা খাতে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে করে দেশের নারী উন্নয়নের ইতিহাস, নারী উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলি সম্পর্কে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন উৎস তেকে তত্ত উপাত্ত নিয়ে এসব পর্যালোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, বালাদেশের নারীরা অতীতের তুলনায় অনেকাংশেই শিক্ষা-দীক্ষা ও বিভিন্ন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অতীতের তুলনায় বর্তমানে নারীরা পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে এমনকি পুরুষদের চেয়েও অনেকাংশে এগিয়ে যাচ্ছে। যে নারী এক সময় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হতো সেই নারীর আজ ঘরের বাইরে এমনকি দেশের বাইরেও বিশ্বের কাছে মাথা উচু করে দাঁড়াচ্ছে। অশিক্ষিত অবস্থায় থেকে বেড়িয়ে এসে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দক্ষতা অর্জন করে নিজের শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগাচ্ছে দেশের উন্নয়নে, দেশটাও এগিয়ে যাচ্ছে সবকিছু পেছনে ফেলে। একমাত্র বাংলাদেশ মহিলা সংস্থাই নারীদের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের কাজ স্বাধীনতার পর থেকেই করে যাচ্ছে। আজকের বাংলাদেশে নারীদের বর্তমান অবস্থার জন্য বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মানব সভ্যতা এগিয়েছে অনেকদূর ও মানুষের জীবন যাত্রার মান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে উন্নত হচ্ছে। যে হারে মানুষের জীবন যাত্রার মান পরিবর্তিত হয়ে উন্নত থেকে উন্নতর হচ্ছে। যে হারে মানুষের জীবন যাত্রার মান পরিবর্তিত হচ্ছে সে হারে নারীর ভাগের পরিবর্তন ঘটেনি। জাতীয় মহিলা সংস্থা বাংলাদশের নারী সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে একটি অতীব গুর"ত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থায়নে সরকারী পর্যায়ে নারী উন্নয়নের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে "জাতীয় মহিলা সংস্থা"র ভূমিকার উপর সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা অত্যন্ড় প্রাসংগিক ও যুগোপযোগী। তিন যুগেরও বেশী সময় ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনটির সাংগঠনিক, কাঠামোগত ও পারিপার্শ্বিক দূর্বলতাকে চিহ্নিত করে জাতীয় পর্যায়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এটি যাতে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করাই গবেষণাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই গবেষণা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ড় নারীদের অবস্থান বর্তমান সমাজে অনেকটা উন্নত হয়েছে। যে নারীরা ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করতো অথবা সন্ড়ান উৎপাদনকেই যারা মূখ্য কাজ ভেবে নিতো, সেই নারীরাই আজ ঘরের বাইরে এসে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের উন্নত করে উন্নয়নের উচ্চতর শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। সকল সংস্থা ও সংগঠনের মধ্য থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সংগঠন "বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা" একমাত্র নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, নারীর অগ্রসর জীবনের জন্য বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন দেশে নারী ও পুর"ষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না।

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১-৪
	১.১ প্রারম্ভিকা (Preamble)	১
	১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)	2
	১.২.১ প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যসমুহ (The Specific Objectives of the Study)	৩
	১.৩ গবেষণার তাৎপর্য (Significance of the Study)	৩
	১.৪ তথ্যের উৎস (Sources of Data)	৪
	১.৫ গবেষণা পদ্ধতি (Research Method)	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	তত্ত্বীয় কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা	৬-
	২.২.১ বিশ্ব নারী দিবস: ৮ মার্চ	১০
	২.৩ নারী ক্ষমতায়ন (Woman Empowering)	১৩
	২.৩.১ নারী	১৩
	২.৩.২ ক্ষমতায়ন (Empowering)	১৪
	২.৩.৩ সম্পদ	১৪
	২.৩.৪ নারী ক্ষমতায়ন (Woman Empowering)	১৬
	২.৩.৪.১ নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্য (Vision of Woman Empowering)	১৭
	২.৩.৪.২ নারী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া (Process of Woman Empowering)	১৭
	২.৩.৪.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ	১৮
	২.৩.৪.৪ নারীর ক্ষমতায়নের উপায়	১৮
	২.৩.৪.৫ বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ	১৯
	২.৪ নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার গোঁড়ার কথা	২১
	২.৫ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ	৩০
	২.৬ অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের বঙ্কিম পথরেখা	৩৬
	২.৭ নারী মুক্তি	৪২
	২.৭.১ আন্তর্জাতিক নারী দিবস: বাংলার নারী মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা	৪২
তৃতীয় অধ্যায়	স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশঃ জাতীয় মহিলা সংস্থার উত্থান ও বিবর্তন	৪৬-৫০
	৩.১ স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশ ও নারী	৪৫
	৩.২ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠা	৪৯
চতুর্থ অধ্যায়	জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রম	৫১-৮৩
	৪.১ জাতীয় মহিলা সংস্থার ভিশন	৫১
	৪.২ জাতীয় মহিলা সংস্থার মিশন	৫১
	৪.৩ জাতীয় মহিলা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫১
	৪.৪ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি	৫৫
	৪.৪.১ উন্নয়ন প্রকল্প ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম	৫৫
	৪.৪.২ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম	৫৫

	৪.৪.২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৫৫
	৪.৪.২.২ প্রকল্প এলাকা	৫৬
	৪.৪.২.৩ কার্যক্রম	৫৬
	৪.৪.২.৪ কারিগরি/বাস্তব কাজের খাত	৫৭
	৪.৪.২.৫ বাস্তব অগ্রগতি	৫৮
	৪.৪.২.৬ আর্থিক অগ্রগতি	৫৮
	৪.৪.২.৭ মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৫৯
	৪.৪.৩ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (২য় পর্যায়)	৫৯
	৪.৪.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৫৯
	৪.৪.৩.২ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	৫৯
	৪.৪.৩.৩ কার্যক্রম	৬০
	৪.৪.৩.৪ প্রাক্কলিত ব্যয়	৬১
	৪.৪.৩.৫ কারিগরি/বাস্তব কাজের খাত	৬১
	৪.৪.৩.৬ বাস্তব অগ্রগতি (ব্যর্থতা থাকিলে উহার কারণ উল্লেখসহ)	৬১
	৪.৪.৪ জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৬২
	৪.৪.৪.১ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	৬২
	৪.৪.৪.২ প্রকল্পের পটভূমি	৬২
	৪.৪.৪.৩ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	৬৩
	৪.৪.৫ তথ্য আপা	৬৫
	৪.৪.৬ প্রকল্পের নাম: জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স প্রকল্প।	৬৮
	৪.৪.৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৬৯
	৪.৪.৭ জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা নীতিমালা	৭০
	৪.৪.৭.১ পটভুমি	৭০
	৪.৪.৭.২ হোস্টেল পরিচালনা পদ্ধতি	৭০
	৪.৪.৭.৩ উপদেষ্টা কমিটি	৭০
	৪.৪.৭.৪ উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি	৭১
	৪.৪.৭.৫ পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি	৭২
	৪.৪.৮ হোস্টেলের তহবিল	৭৩
	৪.৪.৮.১ তহবিলের উৎস	৭৩
	৪.৪.৮.২ তহবিল গঠন	৭৩
	৪.৪.৮.৩ তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি	৭৪
	৪.৪.৮.৪ হোস্টেলের সঞ্চয়	৭৪
	৪.৪.৮.৫ হোস্টেলের সম্পদের দায়ভার	৭৪
	৪.৪.৮.৬ হোস্টেলের জনবল	৭৪
	৪.৪.৮.৭ হোস্টেলে ভর্তির যোগ্যতা	৭৫
	৪.৪.৮.৮ শর্তাবলী	৭৫

	৪.৪.৮.৮ ভর্তির নিয়মাবলী	৭৬
	৪.৪.৮.৯ বোর্ডার বাছাই ও ভর্তিঃ	৭৬
	৪.৪.৮.১০ ভর্তি প্রক্রিয়া ও সীট বরাদ্দ	৭৬
	৪.৪.৮.১১ খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৭৭
	৪.৪.৮.১২ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭৮
	৪.৪.৮.১৩ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী	৭৮
	৪.৪.৮.১৪ স্টেলে বিদ্যমান সুবিধাদি	৭৯
	৪.৪.৮.১৫ বোর্ডারের সাক্ষাৎ প্রার্থী	৭৯
	৪.৪.৮.১৬ বোর্ডারদের করণীয়	৮০
	৪.৪.৮.১৭ চিত্তবিনোদন/বিভিন্ন দিবস পালন	৮০
	৪.৪.৮.১৮ বোর্ডারদের বহিস্কারকরণ	৮১
	৪.৪.৮.১৯ হোস্টেল ত্যাগ সংক্রান্ত	৮১
	৪.৪.৯ ডে-কেয়ার সেন্টার	৮২
	৪.৪.৯.১ পটভূমি	৮২
	৪.৪.৯.২ ডে-কেয়ার সেন্টার এর কমিটিসমূহ	৮২
	৪.৪.৯.৩ কার্যপরিধি	৮২
	৪.৪.৯.৪ মনিটরিং কমিটিঃ	৮৩
	৪.৪.৯.৫ কার্যপরিধি	৮৩
	৪.৪.৯.৬ ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশু ভর্তির নিয়মাবলীঃ	৮৩
পঞ্চম অধ্যায়	নারীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় মহিলা সংস্থার অবদান	৮৬-৯৪
	৫.১ নারীর অধিকার ও আইন বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচি	৮৬
	৫.২ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারী: বাংলাদেশ ও ভারতের আইনি চিত্র	৮৯
	৫.৩ ভূ-সম্পত্তিতে নারীর ব্যক্তিগত ও সাংবিধানিক অবস্থান	৯০
	৫.৪ ভূ-সম্পদে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান	৯১
	৫.৪.১ একজন মুসলিম নারী কন্যা হিসেবে যা পায়	৯১
	৫.৪.২ মুসলিম নারী স্ত্রী হিসেবে যা পায়	৯১
	৫.৪.৩ নারী মা হিসেবে যা পায়	৯২
	৫.৪.৪ বোন হিসেবে পায়	৯২
	৫.৪.৫ হিন্দু আইন মতে	৯২
	৫.৪.৬ খ্রিস্টান আইন মতে	৯২
	৫.৫ আমাদের সংবিধানে নারীর অবস্থানঃ	৯৩
	৫.৬ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ	৯৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নারী সনদ ও নারী নীতিমালা বাস্তবায়ন	১১১-১৫৩
	৬.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১ ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা	১১১
	৬.১.১ ভূমিকা	১১১
	৬.১.২ পটভূমি	১১২
	৬.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী	১১৩

	৬.১.৪ বিশ্ব প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশ ও নারী উন্নয়ন	১১৬
	৬.২ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ	১১৭
	৬.২.১ নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান	১১৮
	৬.২.২ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা	১১৯
	৬.৩ নারী ও আইন	১২০
	৬.৩.১ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০	১২১
	৬.৩.২ নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত) ২০০৯	১২১
	৬.৩.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন ২০০৯	১২১
	৬.৪ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	১২১
	৬.৫ নারী মানবসম্পদ	১২২
	৬.৬ রাজনীতি ও প্রশাসন	১২৩
	৬.৭ দারিদ্র্য	১২৪
	৬.৮ নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ	১২৫
	৬.৮.৯ সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা	১২৬
	৬.১০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের	১২৬
	৬.১১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য	১২৭
	৬.১১.১ কন্যা শিশুর উন্নয়ন	১২৯
	৬.১১.২ নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ	১৩০
	৬.১১.৩ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান	১৩১
	৬.১১.৪ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১৩১
	৬.১১.৬ নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৩৩
	৬.১১.৭ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন	১৩৩
	৬.১১.৮ নারীর কর্মসংস্থান	১৩৪
	৬.১১.৯ নারী ও প্রযুক্তি	১৩৫
	৬.১১.১০ নারীর খাদ্য নিরাপত্তা	১৩৬
	৬.১১.১১ নারী ও কৃষি	১৩৬
	৬.১১.১২ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	১৩৬
	৬.১১.১৩ নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন	১৩৭
	৬.১১.১৪ নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	১৩৭
	৬.১১.১৫ গৃহায়ন ও আশ্রয়	১৩৮
	৬.১১.১৬ নারী ও পরিবেশ	১৩৯
	৬.১১.১৭ অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম	১৪০
	৬.১১.১৮ প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম	১৪০
	৬.১১.১৯ নারী ও গণমাধ্যম	১৪১
	৬.১১.২০ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল	১৪১
	৬.১১.২০.১ জাতীয় পর্যায়	১৪২
	৬.১১.২০.২ জেলা ও উপজেলা পর্যায়	১৪৪

	৬.১১.২০.৩ তৃণমূল পর্যায়	১৪৪
	৬.১১.২১ নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা	১৪৫
	৬.১১.২২ নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা	১৪৫
	৬.১১.২৩ নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৪৬
	৬.১১.২৪ কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল	১৪৬
	৬.১১.২৫ আর্থিক ব্যবস্থা	১৪৭
	৬.১১.২৬ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা	১৪৮
	৬.১১.২৭ নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৪৮
	৬.১২ সিডও সনদ বাংলাদেশের নারী ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা	১৪৯
সপ্তম অধ্যায়	বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে জাতীয় মহিলা সংস্থার অবদান মূল্যায়ন	১৫৩
	৭.১ নারী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ	১৫৪
	৭.২ অন্যান্য দেশে সমসাময়িক আন্দোলন	১৫৬
	৭.৩ ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন	১৫৬
	৭.৪ বিশ্বকে পরিবর্তন করে দেয়া ১০ নারী আন্দোলন	১৫৯
	৭.৪.১ ব্ল্যাক ফ্রাইডে, ১৮ নভেম্বর, ১৯১০	১৬০
	৭.৪.২ মিস আমেরিকা, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮	১৬০
	৭.৪.৩ আইসল্যান্ড, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৫	১৬১
	৭.৪.৪ উইলসডন, নর্থ লন্ডন, ১৯৭৬-৭৮	১৬১
	৭.৪.৫ আফগানিস্তান, মে ২০০৭	১১৬২
	৭.৪.৬ ব্যাঙ্গালোর, ইন্ডিয়া, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯	১৬২
	৭.৪.৭ কাম্পালা, উগান্ডা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৬৩
	৭.৪.৮ লিমা, পেরু ৭ মার্চ, ২০১৪	১৬৩
	৭.৪.৯ বেজিং, চীন, মার্চ ২০১৫	১৬৩
	৭.৪.১০ লন্ডন, ৭ অক্টোবর, ২০১৫	১৬৪
	৭.৫ আন্দোলন সংগ্রামে নারী	১৬৪
	৭.৬ নারীমুক্তি আন্দোলনে সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকা	১৬৬
	৭.৭ নিয়মগুলো ছিল এরকম:	১৬৭
	৭.৮ অসহযোগ আন্দোলনে নারী	১৭২
	৭.৯ খিলাফত আন্দোলনে নারী :	১৭৩
অষ্টম অধ্যায়	উপসংহার	১৮০
	Bibliography	১৮২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভিকা (Preamble)

যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি এবং কৃষিযুগের সূচনাও হয়েছিল নারীর মাধ্যমে। তাই পুরুষের পাশাপাশি সভ্যতার গড়নে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বেও শ্রমঘণ্টার হিসেবে পুরুষের তুলনায় নারীর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান শ্রমঘণ্টা অনেক বেশি। মানব সভ্যতা এগিয়েছে অনেকদূর ও মানুষের জীবনযাত্রার মান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে উন্নত থেকে উন্নতর হচ্ছে। যে হারে মানুষের জীবনযাত্রার মান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে সে হারে নারীর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মানুষ যখন মঙ্গলগ্রহে বসবাসের চিন্তায় বিভোর; একই সময়ে বিশ্বের অনেক সমাজেই নারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অধীকারহীন জীবন ভোগ করতে হচ্ছে। ইতিহাসের ধারায় নারীর সামাজিক অবস্থান অধস্থনে এবং অসম লিঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে কালাতিপাত করতে হচ্ছে। UNDP (2013) এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ব দারিদ্র্যের ৭০% হচ্ছে নারী এবং বিশ্বের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে নারী[1]। তাই আজো প্রতিনিয়ত নারীকে মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও নারীর উন্নয়ন যে হয়নি সেটা বলা যাবেনা।

জাতীয় মহিলা সংস্থা বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নতি ও কল্যান সাধনে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও নারীর স্বাধীকার ও উন্নয়ন ঘটেছে। বিশ্বের অনন্য দৃষ্টান্ত এখন বাংলাদেশ। কেননা এদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং স্পীকারের পদগুলো অলঙ্কৃত করেছেন তিনজন নারী। বিশ্বের যেকোন দেশের উন্নত দেশের তুলনায় সেদিক থেকে বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অবস্থান দৃশ্যত দৃষ্টান্তস্বরূপ। নারীর আজকের এ অবস্থানে পৌঁছার পেছনে রয়েছে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠনসহ নানা দেশী-বিদেশী সংস্থার ভূমিকা। অবিভক্ত বাংলায় নারীমুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মাধ্যমে নারীমুক্তির যে

[1] মানব উন্নয়ন এর রিপোর্ট, *UNDP (2013)*

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতায় প্রীতিলতা, বেগম সুফিয়া কামাল, ইলামিত্র বিশেষ অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে নারীর সমাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় নারী উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা[2]। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস দিবস আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে[3]। মেক্সিকোতে ১৯৭৫ সালে জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারী অধিকারের বিষয়গুলো উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে[4]। জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি মহিলা সংস্থার রূপরেখা প্রণীত হয়, যা ১৯৭৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে[5]। পরবর্তীতে সংস্থার কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের ৪ঠা মে তারিখে ৯নং আইন বলে জাতীয় মহিলা সংস্থা একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলা ও ৫০টি উপজেলায় সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নারীকে স্বাবলম্বী করা এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়সঙ্গত অধীকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র জাতোয় মহিলা সংস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী মুক্তির জন্য তার কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর প্রেক্ষিতে এই সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও নারী মুক্তির ক্ষেত্রে এর অবদান পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় উপাদানগুলো গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা দরকার। কেননা এই সকল উপাদান ভবিষ্যত নারীমুক্তির আন্দোলনকে আরো বেগবান ও গতিশীল করবে।

---

[২] *http://www.totthoapa.gov.bd/bn/content/*জাতীয়-মহিলা-সংস্থা। *Retrieved:* ১২ জুন, ২০১৮

[৩] *https://bn.wikipedia.org/wiki/*আন্তর্জাতিক_নারী_দিবস। *Retrieved:* ২৪ জুন, ২০১৮

[4] জাতীয় মহিলা সংস্থার ইতিহাস (*http://jms.portal.gov.bd/*) *Retrieved:* ১২ এপ্রিল, ২০১৮

[5] জাতীয় মহিলা সংস্থার ইতিহাস (*http://jms.portal.gov.bd/*) *Retrieved:*২৩ আগস্ট, ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

স্বাধীনতার পরবর্তীতে নারীর অধীকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীমুক্তির জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থার ভূমিকা সার্বিক পর্যালোচনা করাই হচ্ছে এ গবেষণার মূল লক্ষ্য।

১.২.১ প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যসমুহ (The Specific Objectives of the Study)

- ❖ জাতীয় মহিলা সংস্থা কার্যক্রম সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান আহরণ করা।
- ❖ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতটুকু বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছে তা জানা।
- ❖ নারীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্টায় এর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা।
- ❖ এই প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিরূপণ করা।
- ❖ আন্তর্জাতিক নারী সনদ বাস্তবায়নে ও জাতীয় নারী নীতিমালা সমন্বয় করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই সংস্থার পদক্ষেপগুলো মূল্যায়ণ করা।
- ❖ বাংলাদেশে স্বাধীনতাত্তোর নারীমুক্তির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতাগুলো চিহ্নিত করা।

১.৩ গবেষণার তাৎপর্য (Significance of the Study)

বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত স্বাধীন-পরাধীন সব দেশেই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবস্থান অধঃস্থনে। নারী অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ি কারণগুলোর যেগুলো মূলে গৃহীত রয়েছে প্রতিটি সমাজব্যবস্থা তথা সমাজকাঠামো, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে। তাই সভ্যতার ঊষালগ্নে যেমন ব্যক্তি বা কিছুসংখ্যক ব্যক্তির উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল আজকের উন্নত গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে তা একেবারেই অসম্ভব। সমাজ ব্যবস্থা যতই আধুনিক হচ্ছে ততই রাষ্ট্রীয় কাঠামো কিছু সংবিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত করতে হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কোন কিছু করা অসম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি উদ্যোগ নেয় তা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। নারী মুক্তি একটি বিষয় যা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মতো স্বাধীন দেশে একক কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের সময় নারীর সমাধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং জাতিসংঘের গৃহীত নারী সনদের বাস্তবায়নের জন্যই জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এ সংস্থাটির কার্যক্রম, সফলতা-ব্যর্থতা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সামাজতাত্ত্বিক কোন হস্তক্ষেপ আছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাছাড়া এই সংস্থার গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে কতটুকু বাস্তবমুখী সে বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে জাতীয় নীতি নির্ধারণে সহযোগিতা করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বিধায় এ বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১.৪ তথ্যের উৎস (Sources of Data)

গবেষণাটি মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (Primary and Secondary) তথ্য নির্ভর।

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):

সংস্থাটির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গৃহীত কার্যক্রমের সুবিধাভোগী (beneficiaries) মহিলাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা সংস্থাটির কার্যক্রমের সঠিক চিত্র পেতে সহায়তা করবে।

মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources):

বাংলাদেশের নারীমুক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তাত্ত্বিক পটভূমি আলোচনা ও পর্যালোচনা করার জন্য মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ, পত্রিকায় প্রাকাশিত প্রবন্ধ, জার্নাল, বিশ্বকোষ, সাময়িকী, গ্যাজেটিয়ার বিভিন্ন নারী সংস্থার প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি (Research Method)

গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সমন্বয় করে এ গবেষণার জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি, কেস স্টাডি ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এই গবেষণাটি মূলত গুণবাচক বা Qualitative তাই এর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ মূলতঃ গুণবাচক পদ্ধতিতেই করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার উদ্দ্যেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎস

Dhaka University Institutional Repository

থেকে এসব তথ্য অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে করে গবেষণাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেকোন পাঠকই গবেষণাটির অধ্যায়গুলো থেকে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা ও নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারনা পেয়ে যাবেন। গবেষনার গুণগত মান বজায় রাখতে অনেকসময় বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেটি গুনগত পদ্ধতির একটি মূল উপাদান। তথ্য ও তত্ত্বের সাথে সাথে বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী নারী উন্নয়নের যে চিত্র ফুটে উঠেছে সেগুলোর সম্যক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে অনেকটা অবলোকনমূলক পদ্ধতি বা Observation Method এর মাধ্যমে। এটিও গবেষনা পদ্ধতিতে বেশ গুরুত্ব বহণ করছে। সবকিছু মিলিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গুণগত পদ্ধতি বা Qualitative Method একটি যুগান্তকারী পদ্ধতি হিসেবে এই গবেষণায় ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তত্ত্বীয় কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা

নারী অধীকার নিয়ে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল দেখতে পান যে, নারীসংক্রান্ত বিষয়াবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লিখতে শুরু করেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি প্রারম্ভিক নারীবাদী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। ১৮৬১ সালে লিখিত ও ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত দ্য সাবজেকশন অব উইমেন (The Subjection of Woman) শীর্ষক নিবন্ধে নারীদের বৈধভাবে বশীভূতকরণ বিষয়টিকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেন[6]। এর ফলে তা সঠিকভাবে সমতাবিধান থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এ ছাড়াও কার্ল মার্ক্স অসমতার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রমিক তথা নারী শ্রমিকরা কিভাবে সমাজে মালিকদের কাছে শোষিত হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন[7]। নারীদের নিয়ে নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানিরাও অনেক মতবাদ উল্লেখ করেছেন। সবকিছুর মূলে ছিল নারী অধিকার ও নারী সমতার কথা। বাংলাদশ মহিলা সংস্থা এসব নারী অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্যই অগ্রসর হচ্ছে দিগ্বিজয়ীর মতো।

২.১ নারী আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সময় ১৮৫৭ সাল। নিউইয়র্কের পোশাক কারখানায় কাজ করত হাজার হাজার নারী শ্রমিক। তাদের ১৫ ঘণ্টারও বেশি সময় শ্রম দিতে হতো। কিন্তু ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হতেন তারা। কারখানায় পোশাক তৈরি করতে সুই, সুতা, বিদ্যুৎসহ আনুষঙ্গিক যা শ্রমিকরা ব্যবহার করতেন তার বাবদ তাদের বেতন থেকে একটা অংশ কেটে নেওয়া হতো। এ ছাড়া কারখানায় পৌঁছাতে দেরি হলে, টয়লেটে বেশি সময় নিলে ইত্যাদি নানা কারণ দেখিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হতো। দিনের পর দিন এমন সব অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে

---

[6] *Mill, John Stuartk (1869). The Subjection of Women. London: Longmans, Green, Reader & Dyer.*

[7] *Marx, Karl (1948). The Communist Manifesto. London. P-5*

Dhaka University Institutional Repository

করতে একসময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শ্রমিকরা। উপযুক্ত বেতন ও ১০ ঘণ্টা কর্মসময়ের দাবিতে সে বছরের ৮ মার্চ রাস্তায় নামেন তারা।[৪]

সেদিন প্রতিবাদমুখর হাজার হাজার নারী শ্রমিককে দমন করতে তাদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। এ আন্দোলনের ফলে পুরোপুরি দাবি আদায় না হলেও এরই পথ ধরে ১৮৬০ সালে নিউইয়র্ক শহরের পোশাক কারখানার নারীরা 'ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন করেন। বলা যায়, এটা ছিল নারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রথম ধাপ। তবে নারীদের সোচ্চার হওয়ার ইতিহাসের গোড়া পত্তন হয়েছিল তারও আগে ১৬৪৭ সালে। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী অধিকার নিয়ে কথা বলেন মার্গারেট ব্রেন্ট। তিনি মেরিল্যান্ডের অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশের দাবি জানান। কিন্তু তার এ দাবি নাকচ করা হয়।

এরপর ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডের ওলস্ট্যানক্রাফট, যিনি একজন লেখক ও দার্শনিক, তিনি তার 'নারী অধিকারের ন্যায্যতা' নামক গ্রন্থে নারীদের ওপর পুরুষতন্ত্রের নির্যাতন-নিপীড়নের বর্ণনা দেন। ১৮৪০ সালে আমেরিকায় দাসপ্রথা ও মদ্যপান বিলোপ আন্দোলনের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী চেতনা বিকশিত হয়। এর আগে ১৮৩৭ সালে আমেরিকায় প্রথম দাস প্রথাবিরোধী নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালের জুলাইয়ে নারীবাদীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস-এ দুদিনব্যাপী বিশ্বের প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপ কিংবা আমেরিকার মতো অবিভক্ত ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন সেই অর্থে গতিময় ছিল না। অবশ্য এই অনগ্রসরতার পেছনে কাজ করেছে সেখানকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং প্রচলিত মূল্যবোধ।

মজার ব্যাপার হলো ভারতে নারী আন্দোলনের শুরুটা করেছেন একজন পুরুষ। এই মহান ব্যক্তি হলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৯ সালে তারই উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা রদ করা হয়[৯]। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিয়ে বন্ধ করেন এবং বিধবা-বিয়ে চালু করেন। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এ সময় ভারতবর্ষে ৪৩টি বালিকা বিদ্যালয়

[৪] সেলিনা হোসেন (২০১৭), যুগে যুগে নারী আন্দোলন। *পৃষ্ঠা-১২৫ Retrieved:* ২৪ জুন, ২০১৮

[৯] *http://bn.banglapedia.org/index.php?title=*সতীদাহ_প্রথা *Retrieved:* ৮ মার্চ, ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কৃষ্ণভামিনী দাসী, কামিনী সুন্দরী, বামাসুন্দরী দেবী, মোক্ষদা দায়িনী প্রমুখ সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে নারী অধিকারের কথা বলতে শুরু করেন।

১৮৮৫ সালে এ দেশে প্রথম নারীবাদী সংগঠন 'সখি সমিতি' গড়ে তোলেন স্বর্ণকুমারী দেবী[10]। ১৮৮৯ সালে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে ছয়জন নারী যোগ দেন। এ ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, তেভাগা, নানকা, টংক বিদ্রোহসহ বিভিন্ন সংগ্রামে নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। এরা হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, উর্মিলা দেবী, আশালতা সেন, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, প্রভাবতী বসু, লীলা নাগ, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, দৌলতন নেসা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, হোসনে আরা খাতুন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, শান্তি ঘোষ, রানী দাস, ইলা মিত্র, সন্তোষ কুমারী দেবী প্রমুখ।

বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া। তৎকালীন পিছিয়েপড়া মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা, অধিকার সুরক্ষায় নারীর আত্মসচেতনতা, নারীকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া তার সাহিত্য ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলায় নারীমুক্তির আন্দোলন শুরু করেন। নারীবাদ প্রতিষ্ঠার প্রবাদপুরুষ বেগম রোকেয়ার দেখানো পথ ধরে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সার্বিক ক্ষেত্রে নারীর সফলতা লক্ষণীয়। নূরজাহান বেগম, বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, হেনা দাস, সালমা সোবহান প্রমুখ নারীনেত্রী নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

আমাদের নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বত্র সরব, সোচ্চার। তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হচ্ছেন। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার বাইরে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। তারপরও নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন অনেকখানি বাকি থেকে যায়। তাই বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম কর্মসূচি হলো সহিংসতা থেকে নারীকে মুক্ত করা। অপরদিকে বিগত বছরে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুহার কমলেও আমরা এখনো প্রত্যাশা থেকে অনেকখানি দূরে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(১), ২৮(২) ও ২৮(৪) উপধারায়

[10] প্রশান্ত কুমার পাল (২০০২), *রবিজীবনী,* দ্বিতীয় খণ্ড। ১ বৈশাখ ১৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্টভাবে নারী-পুরুষের সমতা, সমধিকার এবং সমমর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে[11]। কিন্তু বাস্তবতা হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সম্পদের মালিকানা নির্ধারণসহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনো নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাট বৈষম্য লক্ষণীয়। এ ছাড়া ব্যাপকভাবে বেড়েছে ইভটিজিং ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা। এখনো যৌতুকের বলি হচ্ছে নারী, বন্ধ হয়নি বাল্যবিয়ে। তাই নারী আন্দোলনের পাশাপাশি সরকারি হস্তক্ষেপে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন ও সর্বোপরি জনসচেতনতা একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশের নারীরা নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে গভীরভাবে বুঝেছিলেন ৪৭-পরবর্তী সময় থেকেই। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা কোনো সংগঠন বা দল থেকে আসেননি, তারা নিজেরা ভাষা আন্দোলনের বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুভব করে যুক্ত হয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে নারীদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার গৌরবময় অতীত আছে। দেশের সংকট মোকাবিলায় কিংবা সমস্যার বেড়াজালে আটকেপড়া নানা ঘটনার সঙ্গে তাদের এই জড়িত হওয়ার পেছনে ছিল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা এবং আন্দোলনের বিস্তার ব্যাপক করার জন্য পুরুষের সঙ্গে একই সমান্তরালে অংশগ্রহণ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিবেচনা করি তাহলে বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের স্বরূপ কি তা আমরা বুঝতে পারি।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মালেকা বেগম[12]। স্বাধীনতা-উত্তর সময় থেকে নারীরা সাংগঠনিকভাবে 'নারী' ইস্যুতে অনবরত কাজ করেছেন, বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করেছেন। আমাদের নারীদের শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এবং আজকের দিনের নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে তাদের এই আন্দোলন ভূমিকা রেখেছিল। এখনো নারীর প্রতি সহিংসতা কমেনি।

নারীরা সরকারপ্রধান থেকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামোয় নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন। বিশ্বের যে কোনো দেশের নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থানের কথা

[11] উপধারা ২৮(১), ২৮(২) ও ২৮(৪), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[12] http://mahilaparishad.org/bangla/sample-page/ *Retrieved:*২৪ জুন, ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষভাবে মূল্যায়িত হবে। তারপরও সহিংসতার জায়গাটিতে নারীর শতভাগ মুক্তি আসেনি। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, আধিপত্য, দমন-পীড়নের পৈশাচিক আচরণ দ্বারা নারী নানাভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। তাই নারী আন্দোলনের প্রয়োজন এখনো একশ' ভাগ।[13]

২.২ নারী আন্দোলনের পরাজয় পর্ব

বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক এবং দার্শনিকদের গবেষণায় দেখা যায়, সমাজ এক সময় মাতৃতান্ত্রিক ছিল। বর্তমানে পুরুষরা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তেমনি আদিম যুগের বড় সময়জুড়ে নারীরা সমাজ নিয়ন্ত্রণ করত। ওই সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি[14] এবং হেনরি লুই মর্গানের 'আদিম সমাজ'সহ[15] আরো বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায়। এঙ্গেলসের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৮৬০ সালের আগে নারী বা পরিবার নিয়ে ইউরোপে কোন গবেষণা হয়নি। আদিমকালে সমাজ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মানুষ এক সময় সভ্য জগতে প্রবেশ করে। সভ্য সমাজের পূর্বে বড় সময়জুড়ে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করে। ওই সময় কার্যত নারী-পুরুষের মধ্যে খুব একটা বিভক্তি ছিল না। মর্গানের (Morgan) মতে, নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরিবার বিকশিত হয়েছে। আদিম যুগে দেখা যায়, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কে বিধি নিষেধ ছিল না। এই কারণে, সন্তানের পিতৃ পরিচয়ও ছিল না।[16] ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী, অনেক দিন পর্যন্ত পুরুষরা সন্তান উৎপাদনের কারণ সম্পর্কে জানত না। ফলে পুরুষের পক্ষে সন্তানের কর্তৃত্ব নিয়ে চিন্তার সুযোগ ছিল না। নারীর পরিচয়ে সন্তান বড় হত। পাশাপাশি, একই সময় কৃষি নিয়ন্ত্রণ করত নারীরা। সন্তান জন্ম ও লালনের সময় পুরুষের সাথে নারী শিকারে যাওয়া থেকে বিরত থাকত। ওই অবসরে সে কৃষিকাজ আবিষ্কার করে। আহরিত ফলমূলের বীজ থেকে যে শস্য উৎপাদিত হয়, তা

[13] সেলিনা হোসেন (২০১৭), যুগে যুগে নারী আন্দোলন। পৃষ্ঠা-৮৫

[14] ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'। পৃষ্ঠা-১১১

[15] হেনরি লুই মর্গান, 'আদিম সমাজ। পৃষ্ঠা-৬৫

[16] *ibid*

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম নারীই খেয়াল করে। ফলে মানব ইতিহাসে কৃষিকাজ নারীর হাত ধরে বিকশিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায়, নারী দীর্ঘদিন কৃষি নিয়ন্ত্রণ করত। কারণ, ওই সময় পুরুষরা শিকারে ব্যস্ত থাকত।

এরও অনেক কাল পরে মানুষের শ্রম বিভাজনের ঘটনা ঘটে। জার্মান Ideology-তে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলছেন, মানুষের ইতিহাসে নারী এবং পুরুষের কাজের পরিধি নিয়ে প্রথম শ্রম বিভাজনের সূত্রপাত। পাশাপাশি প্রথম যে শ্রেণী নিপীড়ন সেটাও নারী এবং পুরুষের মধ্যে। একে আখ্যায়িত করা হয়েছে First great division of labour-হিসেবে।[17] শ্রম বিভাজনে দেখা যায়, উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের কাজ পৃথক হয়ে যায়। মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে উৎপাদন। খাওয়া-দাওয়া, সম্পদ এবং আশ্রয়ের জন্য মানুষকে উৎপাদনে যুক্ত থাকতে হয়। আর এই উৎপাদন প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ পুরুষের হাতে চলে যায়। অন্যদিকে পুনরুৎপাদনের জন্য নারীরা গৃহে আবদ্ধ হয়ে যায়। পুনরুৎপাদন বলতে সন্তান জন্ম দেয়াকে বুঝানো হয়ে থাকে। সন্তানের লালন পালনও এর সাথে যুক্ত। যা হোক, উৎপাদন কর্মকাণ্ডের ভার দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ায় পুরুষের হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে নারীর ঐতিহাসিক পরাজয় সূচিত হয়। হাজারো বছর ধরে এ পরাজয়ের বিরুদ্ধে নারীর অবস্থান দেখা যায়নি। মূলত ইউরোপজুড়ে যখন রেনেসাঁসের উদ্ভব, তখন নারীকে অধিকারের দাবিতে স্বল্প পরিসরে অবস্থান নিতে দেখা যায়। নারী দিবসসহ আরো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আজকের নারী তার অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন। কিন্তু, তা একদিনে পরিণতি লাভ করেনি। পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস।

২.২.১ বিশ্ব নারী দিবস: ৮ মার্চ

১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে মহান ৮ মার্চের উদ্ভব। তখন নিউইয়র্ক বস্ত্র কারখানায় হাজার হাজার নারী শ্রমিক কাজ করত। তাদের দৈনিক ১৫ ঘন্টার উপরে পরিশ্রম করতে হত। কিন্তু, সে অনুপাতে মজুরি দেয়া হত না। সুঁচ, সুতা, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যেসব জিনিসপত্র নারীরা ব্যবহার করত, মালিকরা সে বাবদ বেতন থেকে কেটে রাখত। বিলম্বে ফ্যাক্টরিতে যাওয়া, কাজের ক্ষতি করা অথবা টয়লেটে বেশি সময় নেয়ার জন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হত। মালিক গোষ্ঠীর এ অমানবিক

[17] মার্কস এবং এঙ্গেলস, জার্মান তত্ত্ব। পৃষ্ঠা-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

শোষণের বিরুদ্ধে ১৮৫৭-এর ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সেলাই কারখানায় নারী শ্রমিকরা উপযুক্ত বেতন ও দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামে। আন্দোলন দমনে পুলিশ নারীদের উপর গুলি চালায়। ধারণা করা হয়, এই ঘটনার মাধ্যমে নারী আন্দোলনের ইতিহাসে পুলিশ প্রথম গুলি চালায়। ফলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়। পরবর্তীতে, নারীর ভোটাধিকার ইস্যু আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে সামনে আসে। আন্দোলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ অধিকার আদায় সম্ভব না হলেও অর্জন নিতান্তই কম ছিল না। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়, ১৮৬০ সালে নিউইয়র্ক শহরের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা দাবি আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্থ হয়। [18] নারী শ্রমিকদের এ সংগ্রামকে স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন কারা জেটকিন[19]। তিনি ১৮৫৭ সালের ১৫ জুলাই জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা জেসেফিন ফিটেল আইসনার ছিলেন একজন শিক্ষিতা নারী। তিনি ফরাসি বিপ্লবের অবাধ স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মায়ের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে কারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হন। পড়াশুনায়ও তিনি বেশ কৃতিত্ব দেখান। ১৮৭৮ সালে তিনি সিবার ইনস্টিটিউট থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এর মাধ্যমে কারা শিক্ষকতার সনদ অর্জন করেন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, অগাস্ট বেবেল, মার্কসের কন্যা ল্যারা লাফার্গ, কার্ল লাইভনেখত, রোজা লুক্সেমবার্গ, লেনিনসহ আরো অনেক বিশ্ব নেতার সাথে তার গভীর হৃদ্যতা ছিল। তিনি ১৯০৫ সালে 'গ্রিকহাইট' নামক তার বিখ্যাত প্রকাশনা ও সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯০৭ সালে আন্তর্জাতিক নারী সংস্থা (International women's Bureau) প্রতিষ্ঠিত হলে কারা তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে কমিউনিস্টদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে কারা ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। পরের বছর অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানিতে প্রথমবারের মতো নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১৩ ও '১৪ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিবাদ হিসেবে পালিত হয়। নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় নারী-পুরুষের সমঅধিকারের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ দাপ্তরিকভাবে ৮ মার্চকে নারী দিবস ঘোষণা

---

[18] *http://www.somewhereinblog.net/blog/zamiruddinrussell80/29112387 Retrieved:* ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

[19] *রণদীপম বসু,* উল্টোস্রোতের কূলঠিকানা, প্রসঙ্গ- নারী দিবস। পৃষ্ঠা-১৬৩

করে। তৎপরবর্তী, জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ৮ মার্চ নারী দিবস পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত মার্চের যে কোন দিন বিভিন্ন দেশে নারী দিবস পালন করা হত। কিন্তু, ১৯১৪ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ৮ মার্চ নারী দিবস পালিত হচ্ছে।[20]

২.৩ নারী ক্ষমতায়ন (Woman Empowerment)

২.৩.১ নারী

নারীকে বিখ্যাত মানুষেরা নানা দৃষ্টিতে দেখেছেন। লিও টলষ্টয় বলেছেন- নারী সমাজ জীবনে এক অনিবার্য নিরানন্দের উৎস। মেয়েদের একটি সুবিধা হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। তাই যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত। পাই যে গোরাম বলেছেন, বিশ্বের সৎ নীতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে শৃঙ্খলা, আলো ও পুরূষ, আর অশুভ নীতি সৃষ্টি করেছে অরাজকতা, অন্ধকার ও নারী। সম্রাট নেপোলিয়ান বলেছেন, মেয়েরা আমাদের দাসী হবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম, মেয়েরা আমাদের সম্পত্তি গাছের ফল যেমন বাগানের মালিকের সম্পত্তি। মেয়েদের সমান অধিকার পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়, মেয়েরা শুধুই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র। জার্মান প্রবাদে আছে, একটি নারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে একটি বিবাদ কমে যায়। টেনিস বলেন, পুরুষ থাকবে মাঠে আর নারী থাকবে রান্নাঘরে। পুরুষের হাতে তলোয়ার মেয়েদের আঙ্গুলে ছুঁচ, পুরুষের আছে মাথা, আর মেয়েদের আছে হৃদয়, পুরুষ আদেশ করে আর মেয়েরা পালন করে; এর ব্যত্যয় হলেই বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য। আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট বলেন, কোনো মেয়ে যখন ভাবে তখন সে অশুভ জিনিসই ভাবে।

এ ধরনের নেতিবাচক ধারণা বিখ্যাত ও জ্ঞানী-গুণী মানুষদের কথায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও প্রায় সব দেশেই নারীদের সম্বন্ধে কতগুলো প্রচলিত কথা হচ্ছে, 'মেয়েদের স্থান ঘরে, গৃহবধুরা অত্যন্ত বুদ্ধিহীন, মেয়েরা যা কথা বলে সেগুলো কেচ্ছা। বুদ্ধিমতি মেয়েরা পুরুষালী হয়। চাকুরে মেয়েদের নারীত্ব থাকে না। একজন চালাক চতুর মেয়ের মস্তিষ্ক বলে কিছু থাকেনা। মেয়েদের নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলাটা তাদের কর্তব্য। সব মেয়েরাই

[20] https://horoppa.wordpress.com/tag/কারা-জেটকিন/ *Retrieved:* ২২ এপ্রিল, ২০১৮

কেবল পোশাক পরিচ্ছদের কথা ভাবে। মেয়েরা সব সময়েই কিছু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। মেয়েদের নিয়মিত ভাবে পেটানো উচিত। মেয়েরা অর্থের মূল্য বুঝে না। মেয়েরা সর্বদাই পুরুষদের ফাঁদে ফেলতে ইচ্ছুক। একজন মেয়ে যদি কোনো পুরুষকে বাধতে না পারে তাহলে সে যথেষ্ট মেয়েই নয়। মেয়েরাই মেয়েদের ঘৃণা করে । মেয়েরা প্রায়শই পরনিন্দা চর্চা করে। বর্তমানে এধরনের নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে।

২.৩.২ ক্ষমতায়ন (Empowerment)

ক্ষমতায়ন একটি জটিল ও বহুমুখী প্রত্যয়। ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টির সাথে ক্ষমতার ধারণাটি জড়িত। বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রনকে ক্ষমতা বলে। এধারণকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

২.৩.৩ সম্পদ

১. ভৌত (জমি, পানি, বল) ২. মানবিক (মানুষ, তাদের শারীরিক শ্রম ও দক্ষতা) ৩. অর্থনৈতিক (অর্থ, অর্থে অভিগম্যতা) ৪. বুদ্ধিভিত্তিক (জ্ঞান, তথ্য, ধারণা)

ক্ষমতায়ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন (Paulo Faire 1973)। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে উঠে এবং তা Welfare, Development, Participation, Control, Access, Conscientisation[21] ইত্যাদি শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয় (longwe, 1990:204) ।

ক্ষমতায়ন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া। Material resources, Intellectual resource ও আদর্শগত ধারণার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ক্ষমতায়ন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ক্ষমতায়ন সম্পর্কে Chandra বলেন “Patriarchal ideology and the male dominance” (Chandra 1997). Empowerment in the simplest form means the manifestation of redistribution of power that challenges. [22]

---

[22] *Chandra 1997*

ক্ষমতায়ন সম্পর্কে Pillai বলেন

Empowerment is an active, multidimensional process which enables woman to realize their full identity and power in all spheres of life. Power is not a commodity to be transacted; nor can it be given by away as aims. Power has to be acquired and it needs to be exercised, sustained and preserved (Pillai, 1995).[23]

ক্ষমতায়ন যার উপর নির্ভর করে-

i) Ability to participate in decision making

ii) Control over economic resources and

iii) Change and equal opportunity

ক্ষমতায়নের স্বরূপ অনেক রকমের হতে পারে। যেমন: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। তবে ক্ষমতায়ন শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অংশগ্রহণের বিষয়কে ঘিরে (নুরুল আলম, ১৯৯৯:৭৬)[24]।

ক্ষমতায়ন ধারণাটি কাঠামোগত ও বিদ্যমান সমাজের কতগুলো সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ড. শওকত বলেন, 'রাষ্ট্র এবং সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে ক্ষমতায়ন বলা হয়'।

[23] *Pillai, 1995*

[24] নুরুল আলম, ১৯৯৯.৭৬

মাহমুদা ইসলাম তার নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন গ্রন্থে বলেন ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা নারী কল্যাণে সমতা এবং সম্পদ আহরণে সমান সুযোগ অর্জনের লক্ষ্য সামনে নিয়ে জেন্ডার বৈষম্য অনুধাবন নিশ্চিত করণ ও বিলোপ সাধনের জন্য একজোট হয়।

Rowland ক্ষমতায়নকে ত্রিমাত্রিক বলে মনে করেন। তার মতে এটা হলো ব্যক্তিগত, সম্পর্কগত এবং সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত দিক হচ্ছে, "A sense of self and individual confidence and capacity and undoing the defects of internalized opposition."

সম্পর্কগত দিক হচ্ছে "Developing the ability to negotiate and influence the nature of a relationship and decisions made within it."

সমষ্টিগত দিক বলতে বুঝায়, "Where individual work together to achieve a more extensive impact than each could have had alone. This includes involvement in political structures but might also cover collective action based on co-operation rather than competition, Collective action may be locally focused for example, groups acting at village or neighborhood level or be more institutionalized such formal procedures of the United Nations."

ক্ষমতায়নকে একটি প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যেখানে সমাজের ক্ষমতাহীনরা বা কম ক্ষমতাবানরা বস্তুগত এবং মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং বৈষম্য ও অধ:স্তনতার মতাদর্শ যা এই অসম বন্টনকে গ্রহণীয় করে তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

২.৩.৪ নারীর ক্ষমতায়ন (Woman Empowerment)

দক্ষিণ এশিয়াতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যথা:

Integrated Development, Economic Development and Awareness raising (Sushama, 1998:50)[25]

সমন্বিত উন্নয়ন তত্ত্বের মূল দর্শন হলো, পরিবার ও সামাজিক সমাজের উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো নারী উন্নয়ন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো, যে বিষয়গুলো নারীর অধঃস্তনতা সৃষ্টি করে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে।

DAWN (Development Alternative with Woman for New era) নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা ব্যখ্যা করতে গিয়ে বলেছে এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য বিহীন এক পৃথিবী গড়ে তোলা। যে পৃথিবীতে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। নাজমা চৌধুরী 'নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও নারী শীর্ষক প্রবন্ধে যে লক্ষ্যগুলির বর্ণনা করেন তাহলো- নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ, নারীর জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্ত সমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ নিজের জীবন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিমণ্ডল, পরিধি ও সম্ভাবনার বিস্তার।[26]

২.৩.৪.১ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য (Vision of Woman Empowerment)

১. পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও নারীর অধ:স্তনতার অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ এবং রূপান্তর করা।

২. কাঠামো ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান যা নারীর প্রতি বৈষম্যকে সমন্বিত ও জোরদার করে তা পরিবর্তন করা। যেমন: পরিবার শ্রেণী, জাতি, বর্ণ, প্রথা, ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান ধর্মীয়, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম, আইন এবং উপর নীচ উন্নয়ন মডেল ইত্যাদিসহ সবকিছু রূপান্তর করা।

---

[25] *Sushama, 1998:50*

[26] নাজমা চৌধুরী, 'নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও নারী। পৃষ্ঠা-১২২

৩. বস্তুগত সম্পদ জ্ঞান এবং সম্পদের উপর অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ।

২.৩.৪.২ নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া (Process of Woman Empowerment)

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যে সকল বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে,

ক) সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় নারীর মনে।

খ) বাইরের শক্তি দ্বারা অবশ্যই ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ বা উৎসাহিত করতে হবে।

গ) ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করতে হবে।

ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন উপর-নীচ বা একমাত্রিক প্রক্রিয়া হতে পারে না।

ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য হতে হবে।

চ) রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যনত্ম নারীর ক্ষমতায়ন সমাজকে রূপান্তর করতে পারে না।

ছ) নারীর ক্ষমতায়ন বিদ্যমান ক্ষমতার ধারণা ও পরিবর্তন করবে।

নারীর ক্ষমতায়নের দ্বারা বিশ্বকে এমন দিকে ধাবিত করতে হবে যেখানে নারী এবং সচেতন পুরুষকে নিশ্চিত করতে হবে যে সম্পদ কেবল সুষমভাবে ব্যবহৃত হবে, নিরাপদভাবে ব্যবহৃত হবে। যেখানে যুদ্ধ এবং নির্যাতন নির্মূল করতে হবে। যেখানে যুদ্ধ এবং নির্যাতন নির্মূল হবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন সবুজ পৃথিবীতে পরিণত হবে।

২.৩.৪.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ:

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা সমূহ হচ্ছে:-

ক) পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ

খ) পিতৃতন্ত্রের সপক্ষে রচিত আইন কানুন

গ) ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি

ঘ) আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশলের অনুসরণ

ঙ) পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি।

২.৩.৪.৪ নারীর ক্ষমতায়নের উপায়:

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের উপায় হচ্ছে:-

ক) রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারীদের দায়িত্ব প্রাপ্তি

খ) নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী আইন পরিবর্তন

গ) সার্বজনীন পারিবারিক আইন বাস্তবায়ন

ঙ) প্রচার মাধ্যমে নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বন্ধ

চ) নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান

ছ) সকল প্রকার কাজ অভিগম্যতা ও গৃহস্থলী কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ

জ) স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ধারা অনুসরণ

ঝ) রাজনীতির গণতন্ত্রায়ন

ঞ) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

২.৩.৪.৫ বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রাসঙ্গিকতা:

জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচকে বাংলাদেশের স্থান ১০৪ টি দেশের মধ্যে ৭৭ তম।[27] এদেশে পারিবারিক নির্যাতনও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে।

একটি জরিপে গ্রামের সবচেয়ে প্রকট সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে মাত্র ৩% পুরুষ গ্রামবাসী নারী নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছেন। বাকি ৯৭% পুরুষ এলাকার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নারী নির্যাতনকে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে। নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রসঙ্গে ৩০% উত্তরদাতা পুরুষ কোন মনত্মব্য করেননি।জরিপে উত্তরদাতা পুরুষের ৫৩.৬% নারীর অধিকারের পক্ষে তাদের মত ব্যক্ত করেছে । আর ৬০% পুরুষ উত্তরদাতা মন্তব্য করেছে যে নারীদের অধিকার সম্পর্কে কিছু জানানোর দরকার নেই।

[27] জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচক, ২০১৬

জাতিসংঘ জনসংখ্য তহবিলের পরিচালিত এই জরিপে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গ্রামের ৫০২ টি পরিবারের পুরুষ সদস্যরা অংশ নিয়েছিল। এই পুরুষ সদস্যরা নারীর অধিকার নিয়ে যা ভাবে তা নিম্নরূপ:-

৬৫% পুরুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্ত্রীকে মারধর করা সমর্থন করে।

৫১%পুরুষ মনে করে সমাজে নারীর অবাধে চলাফেরা উচিৎ নয়।

৬০% পুরুষ মনে করে নারীর চলাফেরা পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিৎ ।

৭০% পুরুষ মনে করে মেয়েদের অবশ্যই পর্দা করা উচিৎ।

৯৭% নারী নির্যাতনকে তার এলাকা বা সমাজের একটি সমস্যা বলে মনে করে না।

৬০%পুরুষ মনে করে স্বামীর কথা মত স্ত্রীর চলা উচিত।

৯৭ % নারীর ধারণ মাতৃত্ব নারীর একটি প্রধান চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য।

৬০% উত্তরদাতা পুরুষ মনে করে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর কাছ থেকে কোন রকম অর্থনৈতিক সুবিধা বা সাহায্য পাওয়া উচিত নয়। [28]

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবেও নারীর যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। জাতীয় বাজেটের বরাদ্দই তার উজ্বল প্রমাণ।

ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৯৯৬ সালে ৮০ টি, ১৯৯৭ সালে ১১৭ টি, ১৯৯৮ সালে ১৩০ টি এবং ১৯৯৯ সালে ১৬৮ টি। [29]

[28] জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল জরিপ, ২০১৬

[29] ইউনিসেফ রিপোর্ট, ১৯৯৬-৯৯

স্যার ভাইভরস ফাউন্ডেশন (এস.এস.এফ.) থেকে প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী ২০০০ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ২২৬ টি, আর ২০০১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এসিড দগ্ধ হয়েছেন ২৭১ জন। এসিড দগ্ধ নারীর মধ্যে বেশীর ভাগই কিশোরী।[30]

The Institute of Democratic Right এর হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালের মার্চ মাসেই এসিড দগ্ধ হয়ে মারা গেছে ২০জন।[31]

নারী সহিংসতা ও নারী নির্যাতন বৃদ্ধির হার আশংকাজনক। সমাজে নারীর প্রতি গড়ে উঠা দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ গুলোও সুস্পষ্ট। তাই বিদ্যমান সংকট নিরসনে যৌক্তিক বিবেচনা করেই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সমাজ গ্রহণ এমন ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে। সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্যকে বিবেচনায় না এনে কোন প্রক্রিয়াতেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। সংস্কার বা পরিবর্তন হঠাৎ করে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। আধিপত্যশীল সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে নতুন করে সমস্যা বাড়াবে। তাই ধীরে ধীরে কৌশলে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে। যাতে কারো প্রতি সুবিচার করতে যেয়ে কারও প্রতি অবিচার না হয়ে পড়ে। নিজস্ব স্বকীয়তা, সংস্কৃতি আত্মপরিচয় হুমকির মুখে না পড়ে। গভীরে প্রোথিত শিকড়ে টান না লাগে, মানসিকভাবে নতুন করে ভাবতে, চিন্তা করতে, মন-মানসকে প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য মানসিক পরিবর্তন ও চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন হবে যা হঠাৎ হয়ে যাবে না। সরকারী বেসরকারী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৃহত্তর জনমানসের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সমন্বয় করে এগিয়ে যেতে হবে।

২.৪ নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার গোড়ার কথা

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে জন্ম নেয়া সত্যাশ্রয়ী বলিষ্ট এক সাহসী পুরুষ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রবল পরাক্রমশালী পুরুষের একেবারে পাশে 'নারী' কে নিয়ে এসে যে বাণীতে বেঁধে পুরুষের সমান

[30] স্যার ভাইভরস ফাউন্ডেশন *(এস.এস.এফ)* রিপোর্ট, ২০০০

[31] *The Institute of Democratic Right* রিপোর্ট, ২০০০

অধিকার বণ্টন করে গেছেন, তার সেই চির অবিস্মরণীয় স্বার্থক বাণীতে বিশ্বাস ও একাত্বতা ঘোষণা করে শুরু করছি আজকের আমার এই নারী বিষয়ক নিবন্ধটি।

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। [32]

নারী! আঃ হাঃ রে! এই নিরীহ নিগৃহীত নির্যাতিত জাতটাকে নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই চোখ পড়ে যায় অতীত ইতিহাসের দিকে। ইতিহাসের পর্বে পর্বে যে কঠিন কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তা পাঠ করতে গেলে বুকে মুচড় লাগে, মর্ম বেদনাটা খুব ভারী ও ব্যতিত হয়ে ওঠে। পৃথিবীর মাটিতে নারী নিপীড়ন ও নৃশংস নির্যাতনের যে গ্লানি আছে, তা বনপুড়া আগুনের মতো ইতিহাসের পাতায় পাতায় দাউ দাউ করে এখনো জ্বলছে। হাজার হাজার বছর ধরে নারীরা পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের জলের মতো অশ্রুপাতে বুক ভাসিয়েছে। হয়তো বা কোন প্রভাত রবি হীরা ঝরিয়েছে তাঁদের সেই অশ্রুবন্যায়, কিংবা তো গভীর নিশিতের নীলাভ আকাশের নিরব তিথি মুক্তোর মূল্যজ দিয়ে গেছে। কিন্তু পুরুষ মানব তার কতোটুকু দিয়েছে? কী ভাবে পেরেছে মানুষ-নারীকে মানুষ নামধারী পুরুষ তার একাধিপত্য বিস্তার করে নিষ্পেষিত করতে। কী ভাবে সম্ভব হয়েছে যুগে যুগে জোর করে চিতায় পুড়ানো থেকে শুরু করে নির্যাস নিয়ে নির্যাতিত করে সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিতে। বড়ই দুঃখের বিষয় গভীর আক্ষেপের সাথেই বলতে হয়, একবিংশ শতাব্দীর অতি সভ্যতার এই সকাল বেলায় এসেও যখন দেখি, নারী নিষ্পেষণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্মর তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত আছে গোটা জনগুষ্টির মোটা এক অংশ। এবং নিঃসন্দেহে এরা মানবতাবাদী নয়; ওরা মূলত যৌনলোভী সুবিধাকুর। ওদেরকে প্রতিহত করার ব্রত এবং পদক্ষেপ হউক আগ্নেগিরি অগ্নোৎপাতের মতো তীর্যক এবং বিনাশী। নারীরা বাসুকির মতো ফণা উঁচিয়ে আসুক ওদের পীড়িত মস্তিষ্কে ছোবল দিতে।

[32] কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৩০), *নারী।* পৃষ্ঠা-৫২

একার পক্ষে সমষ্টির সঙ্গে, বা বলা যায় অপশক্তির সঙ্গে পেরে উঠা খুবই শক্ত এবং কঠিন। তবুও যে বিবেক কাঁদে একটা কিছু করবার জন্যে। তাই মাঝে মাঝে নিপিড়িত অবহেলিত মায়ের এই জাতটাকে নিয়ে কলম ধরি হাতে; তাতে করে কখনো জন্ম নেয়, নারীবাদী ছড়া, কবিতা, ও গল্প, কখনো বা তথ্যভিত্তিক নিবন্ধতে নিমগ্ন হই। যুগ যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রিক বা পুরুষ শাসিত এই সমাজে নারীদের ওপর যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের স্ট্রীম রোলার চালানো হচ্ছে, সেই সম্পর্কিত তথ্য বা ইতিহাস থেকে অনুসন্ধিৎসু এই আমি যে সামান্যটুকু পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অর্জন করি, পাঠশেষে পাঠকদেরকে তার অংশীদার করবার জন্যে একটা অস্থির তাগিদ হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করতে থাকি।

উনবিংশ শতাব্দী ছিলো নারীমুক্তি আন্দোলনের শতাব্দী। এবং এই নারী মুক্তির মধ্য দিয়েই অঙ্কুরোদ্গম ঘঠে 'নারী স্বাধীনতা' নামের আন্দোলন[33]। নারী মুক্তি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে 'নারী স্বাধীনতা' নিয়ে স্বল্প পরিসরে হলেও আলাপ করবো। প্রথমে চোখ ফেরাই নারী মুক্তির সূচনা লগ্নের সময়টার দিকে। নারীর যাতনাময় জীবনে কঠোর বন্ধন, কঠিন কষ্টকর নিপীড়ন এবং শৃঙ্খলিত জীবন থেকে নারীরা বন্ধনমুক্ত হবার প্রেরণা বা বলা যায় মুক্তির পথ খুঁজে পায় এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তখনকার পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের দ্বারা শৃঙ্খলিত নারীদের মুক্তি আন্দোলন কিন্তু সর্বপ্রথম পুরুষরাই শুরু করেন। উনিশ শতকের এই নারীমুক্তি পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর নারীমুক্তি আন্দোলনে যার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সনাতনপন্থী পরিবেশে রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং অজস্র কুসংস্কারযুক্ত হিন্দু সমাজে লালিত হয়েও বিদ্যাসাগর সমকালীন সামাজিক কূপমন্ডূকতা ও ধর্মের নামে ভন্ডামীতে নিজেকে নিবেদিত না করে বরং এসকলের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। এর প্রধান কারণ সমাজকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

[33] নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার গোড়ার কথা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদ্যাসাগরের সময়কার সমাজে হিন্দু বিধবাদের দুর্গতি ছিলো সবচেয়ে দুর্বিষহ ও যন্ত্রণাদায়ক এবং ন্যক্কারজনক। অন্যায় অত্যাচার অশ্রাব্য গালিগালাজ এবং নিষ্পেষণ নিপীড়নে জর্জরিত হিন্দুবিধবা নারীদের মুক্তির পথ ছিলো রুদ্ধ। পুরুষদের একাধিক বিয়েতে কোন বাঁধা ছিলো না। তারা ইচ্ছে করলেই একাধিক রমণীকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতেন। অনেক সময় দেখা গেছে প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর মর্যাদা তো দেয়া হয়নি, কাজের বাঁন্দী-দাসীর মতো আচরণ করা হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ হিসাবে মর্যাদা পর্যন্ত দেয়া হয়নি। এমন কি বারাঙ্গনাদের সান্নিধ্য নেয়া তাদের জন্যে বৈধ বা উন্মুক্ত ছিলো। অপর দিকে আট বা দশ বছরের হিন্দু বাল্যবিধবাকে পুনরায় বিয়ে দেয়াটা পর্যন্ত ছিলো সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। হায়রে শাস্ত্র! শাস্ত্র নামের সুবিধাবাদী অনিষ্টকারী কু-অস্ত্র থেকে কবে যে আমাদের এ সমাজ পুরোপুরি পরিত্রাণ পাবে কে জানে? কবে যে স্বামীপরমার্থ প্রথাটা চিতায় উঠবে জানি না। জানা যায় তখনকার সময় শাস্ত্র অমান্য করে যদি কেউ বিধবাকে বিয়ে করেছে তো মরেছে; তাকে একঘরি করা হতো, সমাজচ্যুত করা হতো। সমস্ত সমাজের ভেতরে প্রচলিত এই প্রতা বা ব্যবস্থা বিদ্যাসাগরের বিবেক এবং মূল্যবোধকে চরমভাবে আঘাত করে। তিনি বিধবা বিবাহ নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এবং এক সময় শাস্ত্র ঘেঁটে শেষ পর্যন্ত তিনি 'পরাশর সংহিতা' নামক ধর্ম শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের পক্ষে সমর্থন পেয়ে যান। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে. 'বিবাহিত নারীর স্বামী যদি উন্মাদ হয়, মারা যায়, সন্ন্যাসী হয়, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সমাজচ্যুত হয় তবে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ শাস্ত্র সম্মত।[34] সমাজের চোখের সামনে শাস্ত্র স্বীকৃত এধরনের প্রমাণ্য দলিল তুলে ধরে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। কিন্তু শত প্রচেষ্টাতে সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করতে পারলেন না একচ্ছত্র পুরুষ শাসিত এই সমাজে। পারলেন না বিধবাদের বিবাহ দিয়ে বৈধব্যের দুঃখ-দুর্দশাকে ঘুচাতে। তখনকার সমাজে দেখা গেছে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাল্য বিধবাদের অনেকেই বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কেউ কেউ জড়িয়ে পড়েছেন অবৈধ গোপন প্রণয়ে। এমন কি কেউ কেউ সামাজিক কলঙ্ক থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার কেউ বা যন্ত্রণা আর উপদ্রপ সহ্য করতে না পেরে পথে নেমেছেন, এবং জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

[34] পরাশর, পরাশর-সংহিতা। পৃষ্ঠা-১৭৫

বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন মূলত সমাজে উৎকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং সমাজে হিন্দু বিধবাদের যে ঘৃণিত, শৃঙ্খলিত জীবন ছিলো সেই জীবন থেকে তাঁদের মুক্তি দেয়ার জন্যে। আইন প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব হবে না ভেবে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে সমাজের শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সহ একটি আবেদন সরকার সমীপে পাঠান। বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৮৫৬ সালে জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ সমর্থনের পক্ষে আইন প্রণীত হয়। এবং এই একই বছর ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর বহু অর্থ ব্যয় করে প্রথম বিধবা বিবাহ দেন। অতঃপর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ টির মতো বিধবা বিবাহ দেন। তাতে করে বিদ্যাসাগর এক সময় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন।[35]

উনবিংশ শতাব্দীতে আরো একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি প্রকট হয়ে দেখা দেয়েছিলো। তা ছিলো, বহু-বিবাহ নামক প্রথা। এই প্রথা চালু থাকায় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কুলীন পুরুষরা একাধিক কুলীন কন্যাকে বিয়ে করতেন। সামাজিক মান-মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে কুলীন পিতা-মাতা প্রচুর অর্থ পণ দিয়ে বয়স্ক মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন পাত্রের কাছে কন্যাকে বিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ফলে কুলীন কন্যারা অচিরেই বিধবা হতেন। এই সমস্যাও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ব্যাপারে শুধু পত্র-পত্রিকায় তিনি লেখালেখি করে ক্ষান্ত দেননি, তিনি বইও লিখেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। বিদ্যাসাগর তাই ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ এই মর্মে আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছ আবেদন করেন। কিন্তু বহুবিদ জটিল কারণে এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্ভব হয়নি।

এক সময় যখন বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা বদ্ধমূল কুসংস্কার গুলোকে নারী নিজেরাই ছাড়ছে না। যদিও কিছু সংখ্যক নারী মুক্তির জন্যে আন্দোলনমুখী হতে চাইতো কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের কারণে পেরে ওঠতো না। অর্থাৎ নারী মুক্তি আন্দোলনে নরীরাই অন্তরায় সৃষ্টি করছেন দেখে তিনি নারী শিক্ষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এমন কি বহু সাধনার ফলে ১৮৪৯ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের

[35] *http://bn.banglapedia.org/index.php?title=*বিদ্যাসাগর,_ঈশ্বরচন্দ্র। *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

সহযোগীতায় মাত্র ২১ জন ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্টিত করেন বেথুন স্কুল।[36] শিক্ষা বিস্তারের এ সংগ্রাম থামেনি তাই ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে পরবর্তী ৭ মাসের মধ্যে তিনি বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসকল করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বহুবার বহুভাবে বহুধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু হাল ছাড়েননি। কারণ বিদ্যাসাগর'র বুকের ভেতর জুড়ে ছিলো মানবতাবোধ এবং নারীদের প্রতি ছিলো সহজাত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আলোকবর্তিকা পাণে ছুটেছেন সারা জীবন এবং সফল স্বার্থক ভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন নারী মুক্তি আন্দোলন।

প্রথমদিকে যে সব মহিলারা শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন: বামা সুন্দরী, দোর্গামোহন দাসর স্ত্রী ব্রাহ্মময়ী দেবী, নিস্তারিণী, রাজলক্ষী সেন, রাধারাণী লাহিড়ী, মনোরমা মজুমদার, চন্দ্রমুখী বসু, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, তটিনী দাস, দুর্গাপুরী দেবী এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এখানে উল্লেখ্য, নবাব ফয়জুন নেসাই প্রথম মুসলমান মহিলা যিনি মেয়েদের জন্যে কুমিল্লায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। এই স্কুল তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৩১ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। অপরপক্ষে, রোকেয়া সাখায়াত হোসেন ১৯০৯ যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কয়েক বছর পরই তা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[37]

নারী শিক্ষার ভেতর দিয়ে কী ভাবে নারী স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সংগ্রাম শুরু হলো, এখন তার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। নারী শিক্ষা সম্পর্কে বাঙালি সমাজে যখন থেকে সচেতনতা দেখা দিতে আরম্ভ করে, নারী স্বাধীনতার ধারণাটিও তখন থেকেই কমবেশী তৈরী হতে থাকে। তবে অন্তরের সেই ধারণকৃত প্রত্যাশিত ধারণাকে প্রকাশ করবার মতো কোন শব্দ বাংলা ভাষায় যেমন ছিলো না, তেমনি কোন ভাবেই প্রকাশ করার ক্ষমতাও কোন নারীর ছিলো না। সম্ভবত ১৮৪২ সালে একজন মহিলাই এ শব্দ প্রথম বারের মতো ব্যবহার করেন। তিনি

---

[36] *http://www.news-bangla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10891&Itemid=44 Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

[37] *http://www.news-bangla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10891&Itemid=44 Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

বেনামীতে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদিত বিদ্যাদর্শন পত্রিকা'য় এক চিঠিতে স্বাধীন মনে কলকাতায় আসার কথা লিখেছিলেন। মহিলার স্বাধীনতা এই ধারণাকে অক্ষয় দত্ত সমর্থন করতে পারেননি, কিন্তু স্বাধীনতার অস্পষ্ট একটা সংজ্ঞা তাঁর মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, স্ত্রী লোকেরা পুরুষের মতো স্বাধীন হউন, অর্থাৎ সর্বত্র গমন, সকলের সহিত কথোপকথনাদি করুন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহিলার স্বাধীনতার ধারণাকে সমর্থন করতে পারেননি, তার কারণ, এতোটুকু স্বাধীনতার জন্যে শিক্ষা সহ যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা তাঁর মতে এই মহিলা বা তখনকার সময় কোন মহিলা-ই লাভ করেননি। এর আঠারো বছর পরে বলা যায় কালের দাবি হিসাবেই ১৮৬০ সালে, স্ত্রী স্বাধীনতা বা যেটাকে আজ আমরা নারী স্বাধীনতা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এই সেই নারী স্বাধীনতা পদটির ব্যবহার দেখতে পাই। ১৮৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মাঘোৎসবে; যেখানে প্রায় ৫০ জন রমণী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর আগে এমনটি কল্পনা পর্যন্ত করা যেতো না।[38]

নারী স্বাধীনতার সূর্যটা কী ভাবে ধীরে ধীরে ভোরের আকাশ সীমা ছাড়িয়ে উঠে আসতে থাকে তার আরো একটি লক্ষণীয় উদাহরণ ইতিহাস আমাদেরকে প্রমাণ করে দেয়। ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে, মেরি কার্পেন্টারের সংবর্ধনা-সভায় এখানে বেশ কয়েকজন কমবয়েসী ব্রাহ্ম নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। যদিও অভ্যস্ত না থাকার কারণে অনেক মহিলা মুখ খুলতে পারেননি, তবে পুরুষরা খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। পুরুষদের একজন নারীদের উদ্দেশ্য করে সে দিন সে-সভায় যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা ছিলো, ভগিনীগণ! আপনাদিগের স্বামীরা যদি আপনাদিগের মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে ভীত হয়েন, আপনারা সাহসী হউন, অগ্রসর হউন, তাঁহাদিগের নীচতাকে অতিক্রম করুন এবং আপনাদের যে ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতা হার তাহা কণ্ঠদেশে পুনর্বার পরিধান করুন। তোমরা জড়বস্তু নও, পশুও নও যে, স্বামী যাহা বলিবে তাহাই করিবে। আমাদিগের ন্যায় তোমাদিগেরও চিন্তা কার্য সকল বিষয়ে তুল্য স্বাধীনতা আছে।

[38] *http://www.news-bangla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10891&Itemid=44 Retrieved:* ২৬ মে, ২০১৮

নারী স্বাধীনতার উষালগ্নে অর্থাৎ ১৮৬৩ সালে ব্রাহ্ম-সমাজের একজন উৎসাহী তরুণ উমেশচন্দ্র গুপ্ত মেয়েদের জন্যে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় মেয়েদের উন্নতির লক্ষ্যে নানা শিক্ষামূলক রচনা প্রকাশিত হতো। মেয়েদের খবর এবং তাদের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হতো। প্রগতিশীল পুরুষদের এভাবে সহযোগীতার কারণে মেয়েরা আস্তে আস্তে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে চার দেয়ালের বাইরে আসতে শুরু করেন। নারীদের স্বাধীনতার ব্যাপারে পুরুষদের এই ইতিবাচক মনোভাব প্রথম দিকে শুধু ব্রাহ্মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তা ইংরেজি শিক্ষিত পুরুষদের অনুমোদন লাভ করে এবং তাঁরা মহিলাদেরকে অন্তঃপুরের অন্ধ কারাগার থেকে মুক্ত করতে আরম্ভ করেন।

১৮৭৫ সালে কলকাতার মায়াসুন্দরী 'নারী স্বাধীনতা'র প্রস্তাবটি বামাবোধিনী পত্রিকায় তার এক লেখায় খুবই সংকীর্ণ ভাবে আনেন। তিনি লিখেন, স্ত্রীলোকের কিছু দেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্ম্মাণ হইল, লোকে তাহার কত প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শুনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিলাম না। আঃ হাঃ রে! শুনে বুকে বড়ই কষ্ট হয়। আজকাল তো তালেবাদের স্ত্রী'রাও অন্তত নিঞ্জা-মার্কা বুরকার ফুঁড়ের ভেতর থেকে নব-নির্মিত জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন কিন্ত তখনকার সময় তাও সম্ভব ছিলো না। হায়রে নারীর নিয়তি আর তাঁর ললাট লিখা। জানি গৃহকোণে তাঁরা বন্দিনী ছিলেন। আর বন্ধীদশায় না থাকবেন কেন; পুরুষদের কাছে যে বিধাতা বার্তা পাঠিয়ে আদেশ দিয়েছেন, নারীদেরকে ঘরের সেঁতসেঁতে অন্ধকোণে বন্দী রেখে পুণ্য অর্জন করার জন্যে।

আমরা জ্ঞানদান নন্দিনী দেবীর অবদানের কথা অস্বীকার করতে পারি না। জ্ঞানদান নন্দিনী যেমন অবরোধ ভাঙার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তেমনি মহিলাদের জন্যে শালীন পোশাক প্রবর্তন করে মেয়েদের বাইরে আসার পথ সুগম করতে সহযোগীতা করেন। ১৮৮০'র দশকে মেয়েদের সমান অধিকার, অথনৈতিক ও সমাজিক ভূমিকা পালনের অধিকার সম্পর্কে সবচেয়ে জোরালো দাবি জানান কৃষ্ণভাবিনী দাস।[39] তিনি স্বামীর সঙ্গে কয়েক বছর বিলেতে ছিলেন এবং তার স্বামীও ছিলেন উদারমনা, আর এটাই তাঁকে সাহায্য করেছিলো স্ত্রী বা নারী স্বাধীনতা

[39] নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার গোড়ার কথা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে। ১৮৮৫ সালে তাঁর ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা গ্রন্থ এবং পরের কয়েক বছর ভারতীতে তাঁর একাধিক প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতা বিস্তারে প্রচুর কাজও করেছিলেন তিনি। এভাবে নিরন্তর কাজ চলতে থাকে নারী স্বাধীনতার ন্যায় সংগত সংগ্রামকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে।

নারী আন্দোলনের প্রদীপ্ত শক্তিধর এক নাম বেগম রোকেয়া। তিনি ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার অন্তর্গত মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের বিখ্যাত সাবের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়ার মায়ের নাম রাহাতুন্নেসা চৌধুরী এবং বাবা'র নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলি সাবের।

বেগম রোকেয়ার ডাক নাম ছিলো রুকু। বিয়ের পর তিনি পরিচিত হলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন হিসাবে। রোকেয়ারা ছিলেন পাঁচ ভাই-বোন। তাঁর বড় বোনের নাম করিমুন্নেসা এবং ছোট বোন হুমায়রা; দু'ভাই ছিলেন ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে রোকেয়ার স্থান চতুর্থ। তিনি তাঁর বোন করিমুন্নেসা ও বড় ভাই ইব্রাহিম'র উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় লেখাপড়া শুরু করেন। রোকেয়া'র পরিবারে আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষার প্রচলন ছিলো কিন্তু বাংলা এবং ইংরেজি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিলো। সর্বপ্রথম রোকেয়ার দু'ভাই সাবের পরিবারের ঐতিহ্যকে সাহসের সাথে ভেঙ্গে দিয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন। জমিদার হিসাবে রোকেয়ার বাবার বেশ নামডাক ছিলো। কিন্তু শক্তি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে কেননা, জমিদারির অবস্থা তখন অস্তমিত সূর্যের মতো প্রায়। অনেক কণ্ঠকিত পথ-প্রান্তর অতিক্রম করে, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে বড় ভাই ও বোন করিমুন্নেসার সাহয্য-সহযোগীতা নিয়ে বেগম রোকেয়া বাংলা এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তাঁর নাম হয় রোকেয়ার সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়ার দুটি কন্যা সন্তান জন্মের পর পরই মারা যায়। রোকেয়া ২৮ বছর বয়সে তার স্বামীকে হারান অর্থাৎ মাত্র দশ বছর ঘর করার পরই পরই তিনি বৈধব্যের বসন পরেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্বামী ভাগলপুরের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর ভেতর দিয়েই শুরু তাঁর সংগ্রামমুখর জীবন। পাঁচ মাসের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী সংগ্রহ করে, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কোন সময়? যে সময় মেয়েদের লেখাপড়া একেবারে নিসিদ্ধ ছিলো। সম্পত্তি নিয়ে স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সন্তানের সাথে বিরোধ হওয়াতে ১৯১০ সালের শেষের দিকে ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতা চলে যান। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে কলকাতার এক গলিতে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল এর কাজ শুরু করেন।[40] স্কুল চালু করার সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে যেমন তিনি সাহায্য সহযোগীতা পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন অসংখ্য অসহ্য লাঞ্ছনা এবং উপহাস।

বেগম রোকেয়া বাস্তবতার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শুধু শিক্ষা দিলেই নারীরা মুক্ত এবং সচেতন হবেন না। তাঁদের নিজস্ব সামাজিক জীবন গঠন করার প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৬ সালে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) নামে এক মহিলা সমিতি প্রতিষ্টা করেন। মহিলা সমিতি প্রতিষ্টার জন্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত যখন দ্বারে দ্বারে ধরণা দিচ্ছিলেন তখন তাঁকে নিয়ে সমাজের অগণিত লোকে অবজ্ঞা অবহেলায় হাসি-ঠাট্টা করেছেন।[41]

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকের কথা। সময়ের বিচারে ব্যাপারটি অবশ্যই বিস্ময়কর তবুও যে সত্য, বাংলার এক রক্ষণশীল মুসলিম সনাতন সংসারে জন্ম নিয়ে এসে বেগম রোকেয়া নামের ক্ষণজন্মা এই মহীয়সী মহিলা যে সাহসীকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা আজও বিরল। যার লিখনী শুরু হয় ১৯০৩ সালের দিকে। লিখনীর ভেতর দিয়ে যার আমৃত্যু সংগ্রাম আর সাধনা ছিলো ঘুণেধরা প্রতাগত সমাজের কঠিন কর্কশ পুরানো প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্টা করা। বেগম রোকেয়া সারাটি জীবন প্রবল প্রত্যাশা বুকে নিয়ে প্রচন্ড প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন নারীর অধিকার প্রতিষ্টা করে পরিমার্জিত সুশীল সুন্দর প্রশান্তিময় এক সমাজ গঠন করতে। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৩১১ বঙ্গাব্দে। মতিচূর নামক এই গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে তিনি নারী মুক্তি

---

[40] *https://bn.wikipedia.org/wiki/*রোকেয়া_সাখাওয়াত_হোসেন। *Retrieved:* ২৮ এপ্রিল, ২০১৮

[41] *https://bn.wikipedia.org/wiki/*রোকেয়া_সাখাওয়াত_হোসেন। *Retrieved:* ১৪ জুন, ২০১৮

এবং নারীর সামাজিক অধিকার ও উন্নতির কথা বলে গেছেন। বেগম রোকেয়া বিবাহের পর তাঁর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন'র কাছেও ইংরেজি লেখা ও পড়া শিখে বিশ্বকে জানার সুযোগ, সাহস ও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন বলেই নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করবার পক্রিয়া ও কৌশলগত দিক নিয়ে প্রজ্ঞাবান আলোচনা-সমালোচনা করতে তিনি পেরে ছিলেন। রোকেয়া নারীবাদী লেখিকা মেরী করেলির রচনা থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি অনেক রচনাই পড়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে তাঁর লেখায় যুক্তিবাদ ও মৌলিকতা ছিলো। ১৯০৪ সাল থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর নারী স্বাধীনতা বিষয়ক গ্রন্থসমূহ। তিনি তাঁর লেখার ভেতর নারী শিক্ষাকে যেমন গুরুত্ব দিতেন তেমনি আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দিতেন তা ছিলো অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি বলতেন এবং বিশ্বাস করতেন নারীর সত্যিকার মুক্তি আসতে পারে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে। এমন কি মেয়েদের জন্যে তথাকথিত ভদ্র পেশার কথাই কেবল তিনি বলেননি, মেয়েরা জমিতেও কাজ করতে পারেন এ কথাও বলেছিলেন। পুরুষরা যে মেয়েদের বন্দী করে রেখেছেন টাকা, গায়ের জোর এবং ধর্মের নামে, আর মেয়েরা যে একটা নির্যাতিত শ্রেণীর সদস্য এই নারীবাদী ধারণা তিনি সেযুগেই প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বাস্তব পদক্ষেপও তিনি নিয়েছিলেন। নারীদের মুক্তি আর স্বাধীনতার ব্যাপারে যে সকল বলিষ্ঠ বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন, এখন পর্যন্ত আর কেউ-ই তাঁর বক্তব্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে আরো যাঁরা অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, কেশবচন্দ্র সেন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রগতিশীল পণ্ডিত ব্যক্তিবৃন্দ।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর আকস্মিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সারা বিশ্ব জোড়ে নারীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে যে বা যারা সংগ্রাম ও আন্দোলন করে নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার পথকে সুগম-সুদৃঢ় করে গেছেন, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে আসন্ন দিনের নবীরা তাঁদেরই নির্দেশিত পথে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগ্রাম ও লড়াই চালিয়ে যাবে এই প্রত্যাশাটি রেখে নিবন্ধটির যবনিকা টানলাম। এবং সাথে সাথে আশা থাকলো আগামী ৯ ই ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে রোকেয়া সাখাওয়াতর মৃত্যুবার্ষিকী উভয় বাংলায় উদযাপিত হবে।

২.৫ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এক গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশে নারীপুরুষ সমযোগ্যতায়, সমচিন্তায় বেড়ে উঠবে এটা জাতীয় চিন্তা। জাতি হিসেবে এদেশের মানুষ একটা ইউনিট বিশেষ সমষ্টিগতভাবে বিবেক জাগিয়ে তুলতে পারলেই সবার মাঝে পরিবার সেবা, সমাজ সেবা ও জাতির সেবায় এক চিন্তার উদ্রেক হবে। তাতেই সবার মাঝে ক্ষমতা প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকবেনা- এক ধরনের ক্ষমতায়ন ব্যবস্থা চলমান থাকবে। অন্যান্য দেশের মত এদেশের নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর স্বীকৃতভাবে মতামত ব্যক্ত করার,পরিকল্পনা করার ও তা বাস্তবায়নকরার ক্ষমতা প্রদানকে বুঝায়।

এদেশে নারীর ক্ষমতায়ন চিত্র বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত এক নয়-ভিন্ন এ জন্য যে এ দেশের সংস্কৃতি ভিন্ন। আমাদের স্বাধীন চিন্তা নিয়ে বেড়ে ওঠার বয়স এদেশের স্বাধীনতার বয়সের মত কম বলে এখনও আধুনিক ক্ষমতায়নরীতি বা ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যবস্থা বিশ্বের সাথে একরকম হয়নি। একই গ্রামে বেড়ে ওঠা সব বিশ্বাসের মানুষের মাঝে যেমন আহার বিহারে একই চরিত্র থাকে, গ্রামকে সুখকর পরিবেশ দিবার জন্য সবার একই চিন্তা থাকে- সব সমপ্রদায়ের নারী পুরুষের মাঝে ও তেমনি একই ভাব জাগ্রত থাকা উচিত। এই ভাব কথাটা যেমন বিমূর্ত, ক্ষমতায়ন শব্দটিও তেমনি বিমূর্ত। তবুও ক্ষমতা থাকা না থাকা বিষয়টি বাহ্যিক প্রকাশে ধরা পরে।

ক্ষমতা দুধরনের বৈশিষ্ট নিয়ে চিহ্নিত হয়; অর্থনৈতিক শক্তি ক্ষমতা ও জ্ঞান শক্তির ক্ষমতা। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে জমিদারশ্রেণীর হাতে আর্থিক শক্তি ছিল বলে তাদের কথায়ই সমাজ পরিচালিত হতো। শিক্ষিত লোক যদি সচ্ছল পরিবার থেকে আসত তার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা- সমৃদ্ধ জ্ঞানই শক্তি বা ক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হতো। এই দুই শক্তির মাঝে সেতু বন্ধন হলে নারী বা পুরুষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষমতা ও দায়িত্ব পাশাপাশি চলে। নারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে তার উপর অনেক দায়িত্ব অর্পিত হয়। সামাজিকভাবে নারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে গোটা সমাজচিত্রে তার ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনকেই বুঝায়। সর্বোপরি, নিজের মাঝে কর্তব্য ও দায়িত্ব অনুভব করতে পারলেই ক্ষমতায়ন সম্ভব।

বাংলাদেশে নারী তার নিজ ঐতিহ্য সংরক্ষণে ক্ষমতাবান। সে পরিবারের ও প্রতিদিনের ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের যাবতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করে, কিন্তু নতুন কোন চিন্তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কথাটা এটাই প্রমান করে যে বাংলাদেশে পারিবারিক জীবনে নারীর ক্ষমতায়ন আক্ষরিক অর্থে হয়নি। তেমনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী হওয়া সত্বেও নারী অগ্রগতির আইন তারা সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে তাদের পদগুলো ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। দেশের সর্বোচ্চ পদে তারা অধিষ্ঠিত। পুরুষের মত আমাদের নেত্রীরা সংসদে জাতীয় সমস্যা সমাধানে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের নারীরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে সাতজন নারী প্রধানমন্ত্রী আছেন, দেশ শাসন করছেন- তাদের মাঝে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন। এছাড়া বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বৈদেশিক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রীও নারী।[42]

এদেশে নারী ক্ষমতায়নের প্রথম শর্ত নারী শিক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার আছে। লেখাপরার ফলাফল দেখলে নারীর গৌরবোজ্জ্বল ফলাফলই চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্বেও সামাজিকভাবে বেড়ে উঠার স্তরগুলোতে নারীকে 'নারী' অর্থাৎ দুর্বল জেন্ডার রূপেই এগিয়ে যেতে হয়। একজন মানুষের মত বেড়ে উঠার সুযোগ পায় না। পুরুষ প্রধান পরিবারগুলো নারীর অবাধ মুক্ত বিচরন মেনে নেয়না, সে বিধায় নারীকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেয়না, পারিবারিক ভাবেই সে বাধাগ্রস্ত হয়। এই ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠার বোধটা ইদানিংকালে ভিতরে স্বাধীনভাবে জেগে ওঠা নারীকে আহত করে-পারিবারিক বাধা সে ডিঙ্গাতে পারেনা। সামাজিক রীতি ভাঙ্গতে না পারলে সে তখন আহত হয়- আত্মহুতি দিয়ে। এই চিত্র অতি বেদনাদায়ক। তা হলে প্রশ্ন আসে- শিক্ষিত হয়েও কি নারী পুরুষ সমানভাবে সফলতার ফল ভোগ করতে পারবে না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়- সফলতা এককভাবে আসে না। সম্মিলিত বা মিলিতভাবে অর্জন করতে পারলেই আসে। আজকাল পরিবারে নারীর সফলতা এসেছে বলা চলে। তবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে সমাজের গতিতে

[42] মন্ত্রিপরিষদ - প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

চলার অভ্যাস রপ্ত থাকাটা নারীকে সামাজিক স্বীকৃত পাবার পক্ষে সহায়তা করবে। আমাদের নারীরা ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং করছে।

দীর্ঘ অর্ধশতক ধরে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নারীর সাহসী ভূমিকার কথা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়কাল থেকে শোনা যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন কাজে তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছে। ভাষা আন্দোলনের আত্মসচেতনতার প্রমাণ দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা গ্রহনকারী ছাত্রীরা। প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের সাথে এসময় যারা কাজ করেছিলেন তাদের মাঝে ছিলেন রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া আহমেদ, শাফিয়া খাতুন, কামরুন নাহার লাইলী, নাদিরা বেগম, শমসুন নাহার। এরা ভাষাকন্যা নামে পরিচিত। সুফিয়া আহমেদ ও শমসুন নাহার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়েছিলেন। সারা বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত ও সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম এমন অনেক নারী আছেন।[43]

অনেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন অথবা দেশের ভিতরে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোদ্ধা ও সাহায্যকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে সচেতনাই ক্ষমতা। কর্তব্য সম্পাদন করতে পারাই দায়িত্ব পালন করা। শিক্ষা ও জ্ঞান ক্ষমতা প্রদান করে। দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সাহায্য করে। '৭১ এর মুক্তিযোদ্ধা নারীদের মধ্যেছিলেন- তারামন বিবি, ডা. সিতারা, নাসরিন আহমেদ, নায়লা, লুবনা, ফওজিয়া, নার্গিস এবং আরও অনেকে। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন জাহানারা ইমাম, মুশতারী শফি, ফয়জুন নেসা, মাহফুজা, হাবিবা, কবি সুফিয়া কামাল, সেলিনা এবং আরও অগনিত নারী।[44]

স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। সমান অধিকার লাভ করেছে সংবিধানের ভাষার মধ্য দিয়ে।কিন্তু সমাজের অবকাঠামো পরিবর্তনের শ্লথগতি এ ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে দিচ্ছে না। শিক্ষার হার বাড়া সত্বেও আইন করে নারীর বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হয়েছে, যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ করা

[43] ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫, ইত্তেফাক, ভাষা আন্দোলনে নারী

[44] ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫, ইত্তেফাক, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

হয়েছে। কিন্তু ১৮ বছর বয়সের কম বয়সী মেয়েদের ১৮ বছর বয়স দেখিয়ে বিয়ে দেওয়া বন্ধ হয়নি, যৌতুকের জন্য লাঞ্ছনা ও মৃত্যুবরণ এখনো চলছে। এ অন্যায় প্রতিরোধ করার জন্য পরিবার থেকে নারীর প্রতি অবলাসুলভ মনোভাব পাল্টাতে হবে, ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়ে এ পরিবর্তনের চেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা যাবেনা-যদি করে তা অন্যায় বলে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

যুবতী মেয়েকে নিজের ভবিষ্যত নিশ্চিত ও অর্থোপার্জনক্ষম গড়ে তুলতে হবে- সমাজে এই পরিবর্তন আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অতএব শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেলেই ক্ষমতায়ন হবেনা- পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ও নিয়মের পরিবর্তন আনতে হবে। সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে- একথা সত্য, যেমন, মেয়েরা গার্মেন্টস এ কাজ করছে, সাধারনত শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে, মাঠে কৃষি কাজ করছে- এসব ক্ষেত্রে পরিশ্রম করার সুযোগ থাকলেও মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা নেই। প্রত্যেক পরিবারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীর মতামত ব্যক্ত করার ও তা বাস্তবায়িত করার সুযোগ থাকতে হবে।

কৃষি নির্ভর পরিবারগুলোতে নারী ভাল বীজ সনাক্তকরণে, সময়মত বীজ বপনে, বীজ সংরক্ষণে, পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে সুষম খাদ্য শকসব্জি ফলমূল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিতরণের কাজে অনেক বেশী ভূমিকা রাখে। উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিক হলে এসব নারীদের ক্ষমতা পরিবারের সব পরিকল্পনায় ব্যবহার হয়, পরিবার সম্মান প্রদর্শন করে। এ জাতীয় ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নারীকে পরিবারে অবদান রাখার সুযোগ দিলে সনাতন ধারার পুরুষতান্ত্রিকতার দৌরাত্ম কমতে বাধ্য। এধরনের অগ্রগতির জন্য নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরুষপ্রধান জীবন-ঘনিষ্ঠ ব্যবহার পরিবর্তন অপরিহার্য। নারীর অগ্রগতি পরিবার থেকেই প্রথম ব্যাহত হয়। সনাতন সমাজ পদ্ধতি নারীকে সন্তানের জননীরুপে পূজনীয় করে রাখে। এ চিন্তা নারীর স্বাধীন সত্ত্বা বিকাশের সুযোগ দেয়না। বিবাহিত জীবন ছাড়া মানুষের সেবা ও ধর্মকর্ম করা যায়, এ চিন্তার বিকাশ ঘটানো আজ জরুরী।

"ইভ টিজিং" এক বড় সমস্যা। এ সমস্যা দূর করার জন্য সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে পরিবার থেকে উঠতি বয়সী মেয়েদের শালীন চলাফেরা ও মুক্তচিন্তার বিকাশে সুযোগ পরিবারকেই করে দিতে হবে। সম অধিকার চিন্তার বিকাশ এভাবেই হতে পারে। সাতক্ষীরার আশাশুনিতে আজকাল ঘরের বাহিরে এসে মেয়েরা পরিবারের অনুমতি পেয়ে চিংড়ি চাষে অর্থকরি কাজ করার সুযোগ নিচ্ছে। সেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মেয়ে চিংড়ি চাষ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরনে অংশ নিচ্ছে, আর্থিক স্বনির্ভরতা বেড়েছে তাদের।

একই এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হওয়ায় স্থানীয় ভাবে পুরুষেরা কোন কাজ করতে পারছে না বলে অন্যত্র আয়ের পথ খঁজুতে চলে যায়। মহিলারা পরিবারের প্রধান হিসেবে কাজ করে, স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে সন্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়ে চলে। এ ক্ষেত্রে এনজিওর অর্থায়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায় ও অর্থ আয়ের পরিচয় দিতে পারে। অতএব নারীকে কর্মক্ষম ও বুদ্ধিবিকাশের সুযোগ পরিবারকেই দিতে হবে।

পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগ ও বিবেচ্য। সরকারী ভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নারী সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেওয়া হয় না, মতামত নেওয়া হয়না। এক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহনে ও সদস্যদের চিন্তা প্রকাশ থাকার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। স্বাস্থ্য সচেতন, দুর্যোগ ও পরিবেশ সচেতন নারী পরিবেশ বান্ধব কাজে সফল হতে পারে।সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে বড় বড় বন্যা, আইলা ঝড় ও অন্যান্য বড় বড় ঝড়কে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নারীরা নিতে পারে। সাতক্ষীরা, সন্দীপ এলাকায় এরুপ এক জরিপে জানা গেছে যে ঝড় পূর্ববর্তী সময়ে সমাজের নারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ঝড় মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি নিয়েছে, এবং এতে তারা সফল হয়েছে। একই ভাবে ঝড় পরবর্তী সময়ে পরিবারকে শক্ত হাতে একত্রিত করে রেখে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলোর সহায়তাও পেয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে এ ব্যবস্থার সফলতার ইতিহাস আছে। মূল কারণ হিসাবে বলা যায় যে এর সদস্য ও পরিচালিত পর্ষদের মাঝে নারীর ভূমিকা মুখ্য। নারীকে ক্ষমতা দিলে, স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে পরিবার ও সমাজকে স্বাস্থ্যবান করে তুলতে পারে ও সুখী সমৃদ্ধ

জীবনের কথা ভাবতে পারে। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নের এ পথ ধরেই বর্তমান এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থকরী ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সহায়তার নারী ব্যবসা উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিত নারীরা বাণিজ্যের পথ খুঁজে নিয়ে নিজেদের অবদান রাখতে পারছে। রোকেয়া রহমান, শবনম শাহনাজ দীপা, গীতিআরা শাফিয়া, রাশিদা কে চৌধুরী ব্যবসার জগতে আজ উজ্জ্বল নাম।

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর নারী শ্রমিকেরা অনেক পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তুলছে। নারী ব্যাংকার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, শিক্ষিকার অগ্রগতি বাংলাদেশকে একবিংশ শতকের উপযোগী করে তুলছে। নারী পুলিশ অফিসার, আর্মি অফিসার, নিরাপত্তার কাজে এগিয়ে এসেছে। আশা নামের এনজিওর মাধ্যমে সম্প্রতি অশিক্ষিত এক বিউটি বড়ুয়া রাঙ্গামাটিতে তার স্বামীকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে ও নিজে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়ে সুখী জীবন যাপন করছে। অশিক্ষিত নারীদের অনেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করে বুটিক ব্যবসা করে। সে ব্যবসা দিয়ে তারা দেশের বহুনারীকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। যশোর জেলায় এ কার্যক্রম খুবই সফল হয়েছে।

পরিবারের অভাব দূর করার জন্য সম্প্রতি রেলওয়ে বিভাগের এক কর্মচারীর মেয়ে সালমা লেখাপড়া শিখে পিতার চাকুরির স্থলে ডিজেল ইঞ্জিন চালিকার চাকুরী পেয়েছে। সে নিজে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পেয়ে অশিক্ষিত ভাইদের শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালের সফল নারীর অনেক চিত্র তুলে আনা সম্ভব। সমাজ পরিবর্তনে ও ধর্মীয় চিন্তার গোড়ামী পরিবর্তনে তাদের অবদান অনেক বেশী। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। ছায়ানট মানুষের মাঝে সার্বজনীন চিন্তাধারার বীজ সংস্কৃতি মধ্যদিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাই বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, পৌষ সংক্রান্তিও মেলা, পিঠা উৎসব নারীদের সহযোগিতায় উদযাপিত হয়।

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হয়েও উদার ধর্মচিন্তা গ্রহণ করে নারী ক্ষমতায়নকে রাষ্ট্রের আধুনিকায়নের কাজে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। এদেশের সংস্কৃতি, ভাষা ও স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার উৎসাহ জোগাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষানীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের পরিবর্তনে অসাম্প্রদায়িক চেতনা যুক্ত হওয়ায়

মানুষের ধর্মীয় গোড়ামীর দৃষ্টিভঙ্গী ভাঙ্গবে বলে আশা করা যায়। সবার মাঝে সহমর্মী ভাবের উদ্রেক হবে, স্ব স্ব বিশ্বাসের প্রতি সম্মান বজায় রেখে বাংলাদেশের মানুষ অগ্রসর হতে পারবে। নারীর ক্ষমতায়ন সফল হবে।

২.৬ অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের বঙ্কিম পথরেখা

রাজনৈতিক সংঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, আইনশৃঙ্খলার শিথিলতা ইত্যাদি সামগ্রিক প্রতিকূলতা যখনই আমাদের মনকে শঙ্কাগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়, তখনই যেন আমাদের প্রিয় দেশ কোনো সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। আমরা আবার গর্বিত হই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর সহজাত কর্মোদ্যম ও সব ধরনের প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করার দুর্দমনীয় প্রয়াস দেখে। যার ফলে বিশ্ব-পর্যবেক্ষক বিস্মিত হয়, বাংলাদেশকে পুনরায় উন্নয়নের এক পরীক্ষাগার হিসেবে উল্লেখ করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, জনসংখ্যার আধিক্য ও সুশাসনের অভাব সত্ত্বেও দুই দশক ধরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের সীমায় ধরে রাখা, রপ্তানি আয়ের ঊর্ধ্বমুখিতা এবং বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও ব্যষ্টিক অর্থনীতির শ্লথগতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারার কারণে বাংলাদেশ শুধু উন্নয়নের ধাঁধা'ই সৃষ্টি করেনি, সেই সঙ্গে এক অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।[45] যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিলের মতে, বিশ্বের ১১টি সম্ভাবনাময় দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যে দেশ সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে ২০৩০ সালের মধ্যে।[46] সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যবসায় প্রতিযোগিতার সক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশ গত এক বছরে আট ধাপ এগিয়ে ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১১৮তম স্থান থেকে ১১০তম স্থানে পৌঁছেছে।[47]

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের মতে, এ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য যে উন্নত অবকাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন প্রয়োজন, তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের পক্ষে এ অভাবনীয় অর্জন

---

[45] বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, ২০১৬

[46] ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিল রিপোর্ট, যুক্তরাষ্ট্র, ২০১৭

[47] বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম প্রতিবেদন, ২০১৩

সম্ভব হয়েছে মূলত নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে (অ্যান আনসার্টেন গ্লোরি, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস কনট্রাডিকশন্স ২০১৩)।[48] বাংলাদেশের বেগবান নারী আন্দোলন, সক্রিয় এনজিও কার্যক্রম ও বেইজিং-পরবর্তী বৈশ্বিক নারী উন্নয়ন এজেন্ডার প্রভাবে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি ও তা বাস্তবায়নের কৌশলে যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয় , তার মাধ্যমে বাংলার নারীজীবনে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা হয়, যাকে বিশ্বব্যাংক আখ্যা দিয়েছে 'ফ্রম হুইসপার টু ভয়েসেস' (২০০৮)।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম ধাপটি ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়াস। আশির দশকে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা চরম দারিদ্র্য মোকাবিলা করে উপার্জনের অর্থকরী পথ খুঁজে পায়। পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ২৬ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষ অর্থকরী উন্নয়নের পথ খুঁজে পায় (সূত্র: ব্র্যাক)।[49] এ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশের অধিক নারী, যাঁদের উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৯১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আমাদের দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক হার নেমে আসে ১ দশমিক ৭ শতাংশে। সাম্প্রতিক গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূর করে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ সব দেশকে পেছনে ফেলে অগ্রগামী রয়েছে। সংগত কারণেই বাংলাদেশের নারীর কাছে পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের শিক্ষার গুরুত্ব অনুভূত হয়।[50]

অতি অল্প সময়ে নারীশিক্ষার অভাবনীয় অগ্রগতি, প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গসমতা স্থাপন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অধিক অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় নারীর প্রজনন হার অর্ধেকের বেশি হ্রাস এবং শিশুমৃত্যুর হার ৭২ শতাংশ কমানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ শুধু অনুকরণীয় উদাহরণই সৃষ্টি করেনি, সেই সঙ্গে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে কম্বোডিয়াসহ প্রথম স্থান অধিকার করে জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ

---

[48] অর্মত্য সেন, অ্যান আনসার্টেন গ্লোরি, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস কনট্রাডিকশন্স, ২০১৩

[49] ব্র্যাক

[50] গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স প্রতিবেদন, ২০১৭

করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন (২০১১) অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীশিক্ষার হার (১৫ থেকে ২৪ বছর) ৭৮ শতাংশ, যার বিপরীতে পুরুষের শিক্ষার হার ৭৫ শতাংশ।[51]

মানব-উন্নয়ন সূচকে অভাবনীয় রূপান্তরের কারিগর নারীর পরবর্তী সহজাত পদক্ষেপ ছিল টেকসই জীবিকার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের। এই লক্ষ্যে নারী শুধু ক্ষুদ্রঋণের অর্থকরী ক্রিয়াকর্মে সীমাবদ্ধ না থেকে পুরুষের পাশাপাশি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মজুরিশ্রম-বাজারে প্রবেশের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্তরায়গুলো মোকাবিলা করা নারীর জন্য ছিল এক বিশেষ চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

আশির দশকের শেষভাবে নারী মূলত প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মজুরিশ্রম-বাজারে প্রবেশ করে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান হয়, বিপুলসংখ্যক নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে প্রবেশের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মজুরিশ্রমে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম (৩৬ শতাংশ); যদিও জীবিকার কারণে প্রতিবছর শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে অকৃষি প্রাতিষ্ঠানিক খাতে যেখানে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং পুনর্বৃত্তিমূলক কাজে সস্তা শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, মূলত সেই সব ক্ষেত্রে নারী শ্রমিককে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সে কারণে তৈরি পোশাক, হিমায়িত চিংড়ি, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য এবং চা-শিল্পে নারী শ্রমিকের আধিক্য দেখা যায়, যা আমাদের রপ্তানিশিল্পের প্রধান উৎস। ফলে দেশে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসে নারীর শ্রমের অবদানে।

বাংলাদেশে বিগত দুই দশকে অকৃষি খাতের বহুমাত্রিক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও মূলধারার শ্রমবাজারে (লেবার মার্কেট) লিঙ্গ-নির্বিশেষে নারীর নিয়োগ এখনো সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে অকৃষি খাতে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে মাত্র একজন নারী অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। সে কারণে বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষির তুলনায় শিল্পায়নে অগ্রগামী হলেও এ খাতে নারীর অংশগ্রহণ ১৯ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ১৪ দশমিক ১ শতাংশে নেমেছে, যা নারীর ক্ষমতায়নের পথে এক বিরাট অন্তরায় স্বরূপ। করপোরেট সেক্টরেও একই চিত্র। বাংলাদেশে অবস্থিত ১০টি

[51] মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১১

বৃহত্তম বহুজাতিক কোম্পানির নির্বাহী পর্যায়ে ৮৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৪ জন নারী। দেশের সরকারি, বেসরকারি ও বিশেষায়িত সর্বমোট ৪১টি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৫১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৪৪ জন নারী। সরকারের প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে ৫১৫ জন সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে মাত্র ১৫ জন নারী কর্মরত।

লিঙ্গ-সমতা স্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারী-পুরুষের আনুপাতিক অবস্থানের হার-সংক্রান্ত বৈশ্বিক পরিসংখ্যানে সংগত কারণে বাংলাদেশের অবস্থান উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৩ অনুযায়ী, ১৩৬টি দেশের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য নিরসনে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম, যা ১০ বছরে ১১ ধাপ এগিয়েছে।[52] তবে শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের মান হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থানে, যা ১৯৯১ সাল থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে দুই নেত্রীর রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকা এবং সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০ শতাংশে পৌঁছানোর কারণে। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলে এবং নেতৃত্বে গণতন্ত্রের চর্চার অভাবে এবং অধিকাংশ নারী সাংসদ সরাসরি নির্বাচিত না হওয়ায় নারী অধিকারের সপক্ষে রাজনীতিকদের অবস্থান নেওয়ার সংস্কৃতি এ দেশে এখনো গড়ে ওঠেনি।

গত দুই দশকের অধিক সময়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশ যতটা এগিয়েছে, সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ততটা নয়। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ নারী হলেও সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ ও আচরণে প্রয়োগ করে থাকে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে নারীর ক্ষমতায়ন মূলধারার অংশ না হয়ে ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়। একদিকে আমরা দেখি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশের নারীরা হিমালয় জয় করছে, ছত্রীসেনা হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে, আবার গৃহাঙ্গনে বিনা পারিশ্রমিকে পুরুষের তুলনায় দীর্ঘতর সময় দিচ্ছে। শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবদান রাখছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নারী ভয়শূন্য চিত্তে পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ করতে শেখেনি এবং মুক্তবুদ্ধিতে জীবনের বিকল্প বেছে নিতে অপারগ রয়ে গেছে। তাই পুরুষের

[52] বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০১৩

পাশাপাশি ক্ষমতায়নের সমান্তরাল পথটিও নারীর জন্য অধরা রয়ে গেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে নারী চলাফেরার স্বাধীনতা (মবিলিটি) ও দৃশ্যমানতা (ভিজিবিলিটি) অর্জন করলেও নিয়মানুগভাবে সামাজিক রীতি, আচার ও মানদণ্ড নির্ণয়ে নারী-সামুদয়িক আদর্শ ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪৭-পরবর্তী সময়ে বাংলার নারী জাগরণের সূচনা হয় বিশিষ্ট নারী নেত্রী সুফিয়া কামাল, নূরজাহান বেগম প্রমুখের সমঅধিকারের আন্দোলনের মাধ্যমে, যা পরবর্তী সময়ে এনজিও-ভিত্তিক নারী আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করে।

তাই আমরা দেখি, নারীর আর্থসামাজিক অবদানের কারণে যে দেশের মানব-উন্নয়ন সূচক সময়ের চেয়ে এত অগ্রগামী, সেই দেশেই ১৫ শতাংশ হারে নারী নির্যাতন বেড়ে চলেছে। ধর্ষণ, যৌননিপীড়ন ও ফতোয়ার মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে প্রকাশ্যে নারী নির্যাতন সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। নারীশিক্ষা অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করার পরও স্কুলপড়ুয়া বালিকাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ায় ৬৬ শতাংশ বাল্যবিবাহে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অগ্রগামী দেশ। বাংলাদেশ এক অপার সম্ভাবনার দেশ হওয়া সত্ত্বেও সম্ভাবনার বহু দুয়ার এখনো উন্মোচিত হয়নি নারীর জন্য। আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার চার দশকেও পিতৃতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করার ফলপ্রসূ সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও বিদ্যমান কিছু বৈষম্যমূলক আইন নারীজীবনের ব্যাপ্তিকে সামাজিক বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

নারীর ক্ষমতায়নের বঙ্কিম পথরেখাকে পুরুষের সমান্তরাল করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন আইনের দৃষ্টিতে জীবনের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে 'সিডও' সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন একটি পূর্বশর্ত। সেই সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিকতায় কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে প্রতিটি পর্যায়ে নারীর সম-অন্তর্ভুক্তি অনিবার্য ও আবশ্যিক করতে হবে, যা নারীকে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে নিজের দাবি আদায় ও আত্ম-আবিষ্কারের শক্তি জোগাবে। বিশ্বদরবারে প্রশংসিত আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি করতে হলে উদার গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীনির্বিশেষে লিঙ্গবৈষম্য নিরসন করে একটি সুদৃঢ় আর্থসামাজিক ভিত্তি প্রস্তুত করতে হবে।

তাহলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দেশজ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাবে এবং অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসেবে নারী আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সমান অংশীদারি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে, যার ফলে সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তন আসবে। নারী-পুরুষের সমান্তরাল ক্ষমতায়নই আমাদের স্বপ্নের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[53] প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করে নারী শিক্ষিত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশ নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ করে যাচ্ছে সরকার, যাজাতীয় ভাবে শিক্ষা বিস্তারে ভালো অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য:

- নারী নির্যাতন বন্ধ,
- নারী পাচাররোধ,
- নারী ও শিশুর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা,
- নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
- শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ,
- কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান,
- ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি,
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, এবং
- আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

[53] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১

২.৭ নারী মুক্তি

২.৭.১ আন্তর্জাতিক নারী দিবস: বাংলার নারী মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা

যুগের পর যুগ ধরে অব্যাহত রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা, সতীত্ব, পতিব্রত, আর পর্দার ঘেরাটোপের বাঙালি নারীর জীবনে প্রথম পরিবর্তনের হাওয়া লাগে উনিশ শতকে, ব্রিটিশ শাসন আমলে। মূলত সেই যুগের শিক্ষিত, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান ও চেতনা দ্বারা প্রভাবিত উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে ব্রাহ্মসমাজে পুরুষদের যোগ্য সহধর্মিণীর প্রয়োজনীয়তার তাগিদ থেকেই 'স্ত্রী শিক্ষা', 'স্ত্রী স্বাধীনতা'র প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আসে। যে পুরুষ সম্প্রদায় ইতঃপূর্বে 'অশিক্ষিত' স্ত্রী নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে আদৌ ভাবিত ছিলেন না, তারা এই প্রথমবারের মতো স্ত্রীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের একটা অভাব অনুভব করলেন। তারা আবশ্যক বোধ করেন 'শিক্ষিতা', 'সুসংস্কৃতা' সহধর্মিণীর...একই সঙ্গে দেশে সামাজিক উন্নতির সহায়ক হবেন। অনেকটা জা জাক রুশোর সেই পুরুষের আরাম আর আয়েশকে আবর্তিত করেই নারীকে শিক্ষা প্রদান করা'-র মতোই ছিল এই ইংরেজ প্রভাবিত ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষার ধারণাটিও।

নারী শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি সেই সময়ের বিবেচনায় যুগান্তকারী হলেও এ বিষয়ে উদ্যোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব প্রকট ছিল। মেয়েরা শিক্ষিত হবে, কিন্তু পা বাড়াবে না পুরুষতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোর বাইরে। মোট চাহিদা ছিল মেয়েরা একদিকে পাশ্চাত্যের নারীদের মতো শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবেন, সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশু পালন করবেন, অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রাচীন আর্য নারীদের দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিসেবাও করবেন, শিশুমানস গঠন করবেন এবং আপন চরিত্র-মহিমায় সমগ্র পরিবার ধর্ম-আলোকিত করবেন। তাই যখন প্রাথমিক শিক্ষার পাট চুকিয়ে মেয়েদের ফরমাল শিক্ষার বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের নবীন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ দেখা দেয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকেই বাদ সাধেন। মেয়েদের জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্স পড়ার প্রসঙ্গ এলে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম পুরোধা কেশবচন্দ্র সেন আপত্তি তোলেন, মেয়েরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কী করিবে। মেয়েদের বাইরে চলা সংগত কি না, পুরুষের সঙ্গে বসা ঠিক কি না-এসব বিষয়েও

ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। কেশবচন্দ্র সেনের আরো একটি উক্তি, পর্দার বাইরে মেয়েরা এলে অন্য পুরুষের মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে।

নারী স্বাধীনতা বিষয়ে সেকালের শিক্ষিত নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি যখন শুধু যোগ্য স্ত্রী নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখন এই বিষয়ে বিস্ময়কর ব্যতিক্রমী প্রস্তাবনা তোলেন বেগম রোকেয়া। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনেক বিস্তৃত ও স্পর্শকাতর বিষয়কে প্রশ্ন করার মতো স্পর্ধা দেখান। প্রচলিত ধর্মীয় মিথ্যা পাপের প্ররোচনাকারীরূপে নারীর কাহিনীটির পুনর্নির্মাণ করেন এবং গন্ধম ফলরূপী অভিজ্ঞতা আহরণের মধ্য দিয়ে নারীকে প্রথম জ্ঞানে উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি শুধু নারীদের শিক্ষা লাভের দাবিতেই ক্ষান্ত হননি, বরং পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের দাবি জানান এবং এর জন্য নারীর স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের ওপর জোর দেন। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জজ-সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পর লেডি ভাইসরয় হইয়া এই দেশের সমস্ত নারীকে রানি করিয়া ফেলিব। সমস্ত নারীকে রানি বানানোর সংকল্পের মধ্য দিয়ে রোকেয়া নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের গুরুত্ব ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপরেখা পাওয়া যায় রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন-এ বর্ণিত নারীরাজ্যে। যেখানে পেশিশক্তির বলে নয়, বরং নারী তার বুদ্ধি ও প্রযুক্তিবলে এবং প্রেম ও সত্যের শাসনে এক অভিনব মানবিক সমাজ নির্মাণে সক্ষম হয়। নারীর মুক্তির আবহ তৈরিতে প্রযুক্তির এই ভূমিকা নিয়ে আরো বহু পরে রোকেয়ারই প্রতিধ্বনি শুনি, সিমন দ্য বুভোয়ার কণ্ঠে প্রযুক্তি নারী-পুরুষের পেশির অসমতা বাতিল করতে পারে, শক্তির প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের জন্ম দেয় কেবল একটি সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে, পর্যাপ্ত শক্তি থাকার চাইতে অনেক বেশি থাকাটা এমন কিছু ভালো নয়।

রোকেয়ার এরূপ অগ্রসর ভাবনার পরও বলা চলে, ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ৭০-এর দশক পর্যন্ত নারী মুক্তিবিষয়ক চিন্তায় এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি মূলত ছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত উচ্চ শ্রেণীর নারীদের এক ধরনের সামাজিক মিলনকেন্দ্র। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধকরণ, মেহনতি শ্রমজীবী আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন-নির্যাতনের ফলে এ সময়ে সমাজ-

সচেতন নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়। তবে পঞ্চাশের ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এর ধারাবাহিকতায় ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু আলাদা করে নারী ইস্যু এসব আন্দোলনে সেভাবে ঠাঁই পায়নি। তবে গণতান্ত্রিক এসব আন্দোলনে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ গঠিত হয় মহিলা সংগ্রাম পরিষদ, যা স্বাধীনতা-উত্তরকালে মহিলা পরিষদ নামে কাজ করতে থাকে। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পুরোধা সংগঠন হিসেবে আশির দশকে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজারেরও বেশি। নারী পুনর্বাসন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগঠিত করলেও, উত্তরাধিকার আইন, নারী বিষয়ে রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে শক্ত মতাদর্শিক অবস্থান গ্রহণ এবং আন্দোলন সংগঠনে মাহিলা পরিষদ খুব বেশি অগ্রসর হয়নি। নেতৃত্বের ধর্ম সম্পর্কে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান এবং সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নে দুর্বল অবস্থানই এই অনগ্রসরতার মূল কারণ।

আশির দশকের শেষ দিকে নারী প্রশ্নে যিনি সবচেয়ে আলোড়ন তুলেছেন, বিতর্কিত হয়েছেন এবং একাধারে নন্দিত ও নিন্দিত হয়েছেন, তিনি তসলিমা নাসরিন। বিভিন্ন বিষয়ে নারীর অধস্তন পরিস্থিতির পাশাপাশি তসলিমার অভিনবত্ব ছিল নারীর যৌন-জীবন, নারীর শরীর-ভাবনা, শরীর-সম্পর্কিত বৈষম্য-নির্যাতন ও যন্ত্রণা-বঞ্চনার প্রসঙ্গ সামনে আনা। ধর্মীয় চেতনা প্রভাবিত এ সমাজে যৌনতা নিয়ে একজন নারীর কথনের মাধ্যমে তিনি রীতিমতো স্পর্ধা দেখিয়েছেন। তবে এসব বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি যেভাবে কোরআন-হাদিসকে কটাক্ষ করেছেন, তা এখানকার অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় অভিমানে আঘাত হেনেছে। বলা চলে, নারী মুক্তির বিষয়ে তার আবেগের সততা নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও, তিনি এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সর্বদা যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। ফলে তিনি সাধারণ মানুষের বিরাগভাজন হয়েছেন। তার বক্তব্য মৌলবাদকেও বহুক্ষেত্রে উসকে দিয়েছে। কিন্তু তসলিমার বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত যা-ই থাকুক, লেখকের চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে রাষ্ট্রকে দাঁড়াতে আমরা দেখিনি, তসলিমা এখন প্রবাসে উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছেন।

এর বাইরে আশির দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারী মুক্তির বিষয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থ সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হস্তগত হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক নরী দশক ঘোষণার ফলে সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে উন্নয়ন চিন্তায় নারী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এরই প্রভাবে বাংলাদেশে আশির দশক থেকে নারী শিক্ষা, নারীকে ঋণ দান, আইনি সহায়তা দান, নারীর সচেতনায়ন, ক্ষমতায়ন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি কর্মসূচি এবং নারী বিষয়ে গবেষণার জন্য বিদেশি তহবিলের জোগান হতে থাকে। প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে এসব নারী উন্নয়ন কর্মসূচিই প্রধান স্থান দখল করেছে। কিন্তু লক্ষ রাখতে হবেথএসব নারী উন্নয়ন ভাবনা এখানকার নারীর জীবন এবং সংগ্রামের তাগিদ থেকে উদ্ভূত নয়, বরং এ বিষয়ে প্রণোদনা-সম্পর্কিত বৈদেশিক তহবিল জোগানোর সঙ্গে। এসব উন্নয়ন কর্মসূচি বিদ্যমান পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াইকে সযত্নে এড়িয়ে যায় এবং পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পুরুষকে নারীর প্রধান শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখানকার নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য এ ধরনের ভাবনা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জীবিকার প্রয়োজনে এবং নানা ধরনের সুবিধাবাদিতার খপ্পরে পড়ে এখানকার শিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষের একটি বড় অংশই বিদেশি প্রজেক্ট এবং ফান্ড-ভিত্তিক নারী উন্নয়ন ভাবনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। ফলে এ সময়ে নারীমুক্তি আন্দোলন এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে হারে নারীর ওপর যৌন নিপীড়ন এবং সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে এসব সুবিধাবাদিতার বাইরে এসে বৃহত্তর নারী আন্দোলন সংগঠিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সৎ, সচেতন এবং দায়িত্বশীল নারী-পুরুষ নিশ্চয়ই সেই পথেই হাঁটবেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় নারীর অধিকার, নারীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন তত্ত্ব, উপাত্ত ও প্রেক্ষাপট উল্লেখ্য হয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা নারী উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। আদিকাল থেকে নারীরা নিপীড়িত হলেও সেইসব নিপীড়নের ইতিহাস আজ বিলুপ্তির পথে। নারীরা আজ নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার, দমন পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত। নারীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরবর্তী অধ্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানে মহিলা সংস্থার ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

তৃতীয় অধ্যায়
স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশঃ জাতীয় মহিলা সংস্থার উত্থান ও বিবর্তন

৩.১ স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশ ও নারী

১৯৭১ সাল। পৃথিবীর ইতিহাসে রচিত হয় নতুন এক স্বাধীন ভূখন্ড। লাল সবুজ পতাকা। লাখ লাখ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ মানে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার সশস্ত্র সংগ্রাম। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ঢাকায় আজও সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে। গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শুরু হলো স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাংলার কিশোর তরুণ যুবক সকল বয়সের নর-নারী প্রিয় দেশকে শত্রুমুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর শত্রুমুক্ত হয় বাংলাদেশ।[54] এই স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের পাশাপশি নারীর ভূমিকাও কম নয়। আমরা জানি, যুদ্ধ মানে গোলাগুলি আগুন, যুদ্ধ মানে নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে পলায়ন, যুদ্ধ মানে ঘর-বাড়ি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-শত্রুর নির্যাতন, অত্যাচার। আর যুদ্ধে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নারী। মা, স্ত্রী বা বোন হিসেবে প্রিয়জনকে হারানো এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ নিজের সম্ভ্রম হারানো বাংলাদেশের নারীরা যুগে যুগে জাতির যে কোন ক্রান্তিলগ্নে যেমন এগিয়ে এসেছে, মুক্তিযুদ্ধেও এগিয়ে এসেছেন একইভাবে, যুদ্ধ প্রস্তুতিকাল থেকে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নারীর জীবনে সবচাইতে বেশি নেমে এসেছে দুর্যোগ। মুক্তিযুদ্ধে নারী যেমন অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধে লড়েছেন- তেমনি যুদ্ধাহতদের সেবা দিয়েছেন মুক্তি যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, গোপনে অস্ত্র ও তথ্য সরবরাহ করেছেন জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে। বরিশালের মেয়ে ১৯ বছরের করুণা বেগম। তার স্বামী মুক্তিযোদ্ধা জাহিদুল হাসানসহ আরো তিনজনকে পাকসেনারা গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল তাদের লাশ। প্রতিশোধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় করুণা বেগম তার একমাত্র ছোট ছেলেকে শাশুড়ির কাছে রেখে মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা যোদ্ধার ট্রেনিং নিলেন- চুল কেটে

[54] আলম শামস, মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

পুরুষের ছদ্মবেশে- "গোপন জায়গা থেকে আঘাত কর এবং পালাও"-এই রণকৌশলে বরিশালের 'নলছিড়া' ক্যাম্পের একজন যোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন অপারেশনে অংশও নিলেন সফলতার সাথে। অতঃপর একটা সময়ে এমনি এক অপারেশনে গুরুতরভাবে আহত হয়ে হারালেন একটি পা। আর আহত হওয়ার পরেই সহযোদ্ধারা জেনেছিল উনি একজন নারী। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। করুণা বেগমের মত আরো অনেক নারী হালিমা, ফাতেমা রোকেয়াসহ অনেকে যুদ্ধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচারিত হয়েছেন। যুদ্ধ শেষে পরিবার বা সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি। কয়জন নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা আমরা জানি? দেশকে শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি কয়জনকে দিয়েছে জাতি? প্রায় ৪ যুগ হতে চললো, কয়জন নারীই বা মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি পেয়েছেন?

১৫ বছরের 'গীতা কর' পাকসেনাদের হাতে পিতার মৃত্যুর পরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে যুদ্ধক্যাম্পে ট্রেনিং নিতে গেলেন সেখানে আরো ২০০ জনের মতো মেয়েরা এসেছিল ট্রেনিং নিতে। এদের সবাইকে যুদ্ধের ট্রেনিং শেষে পরবর্তীতে আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৮০ আসনবিশিষ্ট হাসপাতালে যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাদান কাজে নিয়োগ দেয়া হল। যেখানে এরা তাদের ক্ষমতা ও সেবায় নিরলস শ্রম দিয়ে যুদ্ধে আহত যোদ্ধাদের আবারো যুদ্ধে যাবার উপযোগী করার মহৎ কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

এ যুদ্ধের শুরুতে সীমিত আকারে প্রস্তুতিপালা নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রী। যে বীর নারী রোশেনারা সূচনা পর্বে শত্রু পক্ষের একটি প্ল্যাটুন ট্যাংক ধ্বংস করার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেন সরকারিভাবে সংগৃহীত দলিলপত্রে সে বিবরণ এসেছে একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে তাকে বীর বলা হলেও শহীদ বলা হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে খণ্ডিত দলিল হয়েছে সেখানেও নারী মুক্তিযোদ্ধার চিত্র অস্পষ্ট। তৎকালীন পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় ঢাকার একটি গেরিলা স্কোয়াডের প্রধান ছিলেন ফোরকান বেগম যিনি ভারতে পরে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। করুণা বেগমের মতো আরও একজন পুরুষের পোশাকধারী গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন শিরিন বানু মিলিত, স্টেটম্যান পত্রিকায় তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে। "পরবর্তীকালে এক সময় আমি মেজর জলিলকে বলেছিলাম কলকাতা থেকে আসার পরে আমার সাথে বিভা সরকার, যুঁথিকা মণিকা ব্যানার্জী ,গীতা ,

ইরাসহ অনেক মেয়ে ছিল যাদের পরে খুঁজেছি কিন্তু পাইনি।' সিরাজগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা মনিকা মতিনের ভাষায় "যুদ্ধের সময় নারীরা যেন জীবন্ত রাডারের ভূমিকা পালন করেন। আমি যদিও বন্দুক ভালোভাবে চালাতে পারতাম না তবুও রাত্রিতে পাহারা দিবার জন্য দাঁড়াতাম।" বস্তুতপক্ষে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গে সবচাইতে বেদনাদায়ক যে তাদের অনেকের নাম প্রকাশ হতে থাকে স্বাধীনতার প্রায় আটাশ বছর পর থেকে। কাঁকনবিবি ও বরিশালের শাহানা পারভীনকে ১৯৯৯ সালে যথাক্রমে জনকণ্ঠ প্রতিভা সম্মাননা পুরস্কার দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ২৯ এপ্রিল গ্রামবাংলার দুই সাহসী মুক্তিযোদ্ধা মীরা ও হালিমা খাতুনকে পুরস্কৃত করে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। এদের মধ্যে মীরার জীবিকা ছিল কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করা এবং হালিমা ছিলেন দিনমজুর। যাদের দুজনের ভাষ্য অনুযায়ী দেশে এরকম সাধারণ পরিবারের আরো নারী মুক্তিযোদ্ধা আছেন যাদের কেউ কোন খোঁজ নেয় না এবং এভাবে তারা হারিয়ে গেছেন ইতিহাসের পাতা থেকে। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে এসব নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল গোবরা। ক্যাম্প, কোলকাতার পদ্মপুকুর ও পার্ক সার্কাসের মাঝামাঝি তিনজেলায়। যাদের সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং ও মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যেসব নারী পাকবাহিনী ও বাঙালি সহযোগী শক্তির হাতে মারা গেছেন সার্বিক বিবেচনায় তারা সকলেই শহীদ কেউ শত্রুপক্ষের গুলিতে কেউ নির্যাতনে কেউ অপহৃত হয়ে নিখোঁজ বা কেউ বরণ করেছেন স্বেচ্ছামৃত্যু তারা সবাই শহীদ যদিও ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এদের কোন তালিকা প্রণীত হয়নি। শুধু বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হয়েছে কিছু কিছু মৃত্যুর ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনা ও তাদের বাঙালি সহযোগীদের দ্বারা ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক দু'লাখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহীম এবং অধ্যাপক নওশেভা শরাফীর নেতৃত্বে একটি দল ছুটে গিয়েছিলেন ঢাকা ক্যান্টেনমেন্ট যেখানে পাক বন্দিদের সাথে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করছিলেন প্রায় শ'খানেক নির্যাতিত বাঙালি নারী। ওখান থেকে উদ্ধার করা গেল মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন নারীকে আর অন্যান্যদের মধ্যে একজনের বক্তব্য ছিল "অচেনা দেশে হয় পতিতালয়ে যাবো নতুবা রাস্তা ঝাড়– দেয়ার কাজ করবো এর পরেও পরিচয় গোপন তো থাকবে আর আমাদের জন্য পিতা, পুত্র, সন্তানরা অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পাবে। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসে তাদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে সম্মানিত করে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতা দেয়ার

প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গঠিত হল জাতীয় পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং নারী পুনর্বাসন বোর্ড, নির্যাতিতা নারীদের আশ্রয় দেয়া ছাড়াও শিক্ষা ও দক্ষতা অনুসারে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হচ্ছিল। এছাড়া অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ আর, দায়মুক্ত হতে চাচ্ছিলেন সে লক্ষ্যে জানুয়ারি ৭২ থেকে অক্টোবর ৭২ পর্যন্ত গর্ভপাত আইন বৈধ করা হল। একই সাথে এদের সন্তান সংগ্রহ, লালন-পালন এবং বিদেশে দত্তক দেয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করা হল আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ ইউনিয়ন, মহীয়সী নারী মাদার তেরেসা এসময়ে এসব দুঃস্থ নারীদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন-আর তার সংগ্রহকৃত প্রায় ৩০০ জন দুঃস্থ শিশুকে কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের অনেক পরিবার দত্তক নিলেও বাংলাদেশের কোন পরিবার এগিয়ে আসেনি। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এসব নারীদের বিয়ে করার জন্য তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেও সাড়া পাওয়া গেল খুবই কম। আর আশির দশকে এক ধরনের লক্ষ্যহীন মনোবল অবস্থায় সব কর্মসূচির বিলোপ ঘটে এবং শত শত দুঃস্থ ও নির্যাতিত নারী, যারা আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ পাচ্ছিলেন তারা আবারো আশ্রয়হীন হয়ে যায়। বস্তুত পক্ষে 'বীরাঙ্গনা' দের প্রতি কোন প্রকার মানবিক মূল্য পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ও ধর্মোম্মাদনাজনিত মনোভাবের কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং এই উপাধির কারণে অনেকের পক্ষে সমাজের স্রোত ধারায় মিশে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর অনেক ক্ষেত্রে হয়ে পড়ল বিতর্কিত বা আড়ালে অমীমাংসিত। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত নারী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন এবং তাদের পুনর্মিলিত করে কোন সংস্থা সংগঠনের প্রস্তাব নেয়া হয়নি। যদিও যুদ্ধের পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছিল একাধিক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি, যেখানে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তালিকা তখনো পর্যন্ত ছিল না। এভাবে ইতিহাসে নারী বারে বারে উপেক্ষিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অঙ্গনে নারীর অবদান-বলা যায় সর্বক্ষেত্রে, এরপরেও অনেকের নাম রয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে-যদিও ত্যাগের মহোৎসবে নারী সমাজে অনেকে নিজেদের নানাভাবে উৎসর্গ করেছেন, প্রাপ্তি ছিল শুধুই স্বাধীনতা, তবে দেশের সকল নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সত্যিকার অর্থে মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন-নতুবা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে।[55]

[55] আলম শামস, মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

৩.২ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠা

জাতীয় মহিলা সংস্থা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনের পটভূমি হিসেবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নারী সমাজের দূরাবস্থার প্রেক্ষাপট একটি অন্যতম কারণ। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মায়েরা-মেয়েরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তারা সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এক কথায় যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র চালনা, প্রশিক্ষণ ফেয়া, চিকিৎসা সেবা, মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে আশ্রয়দান ও খাদ্য সরবরাহ, পাক সেনাদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদান, যুদ্ধে জনমত গঠন ও উদ্বুদ্ধকরণ, বেতার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্য মে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণকে উৎসাহ জোগানো ইত্যাদি নানাভাবে এই শ্যামল দেশের নারীরা জাতির প্রয়োজনের দিনে নির্ভীক ও অকুতোভয় চিত্তে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [56]

স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় মহিলাদের উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা। ১৯৭৪ সাল জাতিসংঘ কর্তৃক 'নারী বর্ষ' হিসেবে ঘোষিত হয় এবং ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। মেক্সিকোতে ১৯৭৫ সালে জুলাই মাসে অনু ষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে 'নারী দশক হিসেবে ঘোষণার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারী অধীকারের বিষয়গুলি উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। নারী উন্নয়নে সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষার্থে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও তাদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রদত্ত নির্দেশের ফলশ্রুতিতে প্রণীত সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে ১৯৭৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সংস্থার কার্যক্রমকে অধিকতর

[৫৬] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ফলপ্রসূ ও জোরদার করার লক্ষ্যে জাতী মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ৯ নং আইন) এর মাধ্যমে ১৯৯১ সালের ৪ মে জাতীয় মহিলা সংস্থা একতি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়।[57]

[৫৭] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

চতুর্থ অধ্যায়
জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা বিভিন্নভাবে দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। অনেক অস্বচ্ছল নারীর কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রমকে বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে যা প্রশংসার দাবি রাখে।

৪.১ জাতীয় মহিলা সংস্থার ভিশন

সমাজ, রাষ্ট্রে, শান্তি ও উন্নয়নে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন, মানুষ হিসেবে নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় শনাক্তকরণ।[58]

৪.২ জাতীয় মহিলা সংস্থার মিশন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্থার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযতভাবে বাস্তবায়ন। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্বাবলম্বিতা অর্জন, দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর, সামাজিক, রাজনৈতিক আইনগত অধিকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমান সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ।[59]

৪.৩ জাতীয় মহিলা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;
- মহিলাদের জন্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

[58] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৯ জুলাই, ২০১৮

[59] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২০ মে, ২০১৮

- অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে মহিলাদের সহায়তা করা;
- মহিলাদের আইনগত অধিকার রক্ষার্থে সাহায্য করা;
- পরিবার কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করা;
- মহিলাদের কল্যাণে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী, দেশি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা ও সহযোগিতা করা;
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- সমবায় সমিতি গঠন ও কুটির শিল্প স্থাপনে মহিলাদের উৎসাহিত করা;
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- মহিলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা;
- উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যেকোন পদেক্ষেপ গ্রহণ করা।[60]

উপরি উল্লিখিত উদ্দ্যেশ্য বস্তবায়নে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

৪.৪ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

৪.৪.১ উন্নয়ন প্রকল্প ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের তালিকা:

১) নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প

২) অথনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৩) জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৪) তথ্য আপা : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

৫) জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প

[60] জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১

৪.৪.২ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম:

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম প্রকল্পের সারসংক্ষেপঃ

প্রকল্পের নাম: নগর ভিত্তিক প্রামিত্মক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প।

উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় মহিলা সংস্থা।

বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৪.৪.২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) দারিদ্র বিমোচন এবং দরিদ্র, দুস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদের স্বাবলম্বী করা।

খ) ঘরে দ্রব্যাতি তৈরীতে অভ্যস্থ মহিলাদের উৎপাদনমুখী ও কর্মক্ষম করে তোলা।

গ) মহিলাদের কর্মতৎপর করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ) উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

ঙ) মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো এবং প্রয়োজনের সময় আইনী সহায়তা প্রদান।

চ) নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার, দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

ছ) প্রশিক্ষত মহিলাদের তৈরী দ্রব্যাদির বাজার সুবিধা সৃজন।

জ) ফলোআপ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মহিলাদের আত্ম -কর্মসংস্থান/ কর্মসংস্থান সম্পর্কে ধারনা প্রদান।[61]

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

সকল বিভাগে ৪৬টি বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,৬০০ জন অনগ্রসর, দরিদ্র, বেকার, বিত্তহীন, মহিলাকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষিত মহিলাদের ঋণ/আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আত্ম-কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

[61] বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা (http://www.mowca.gov.bd) *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

৪.৪.২.২ প্রকল্প এলাকা:

মোট ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫টি, রাজশাহী বিভাগে ৮টি, খুলনা বিভাগে ৩টি, সিলেট বিভাগে ৩টি এবং বরিশাল বিভাগে ৫টি।

৪.৪.২.৩ কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭৬০০ জন প্রান্তিক মহিলাকে ১০টি বিভিন্ন ট্রেডে যথা- সেলাই ও এমব্রয়ডারী, ব্লক- বাটিক এন্ড স্ক্রীণ প্রিন্ট, সাবান ও মোমবাতি তৈরী,বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং, পোলট্রি উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, চামড়াজাত দ্রব্যতৈরী, নকশী কাঁথা, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাউস কিপিং এর উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষণার্থীদের জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত আবর্তক ঋণ তহবিলের অর্থ থেকে ১০,০০০/- টাকা থেকে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ/আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পের মোট জনবল ১১০ জন এর মধ্যে ৪৯ জন কর্মকর্তা এবং ৬১ জন কর্মচারী। প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে এবং অন্যান্য পদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য। ৬১ জন কর্মচারীর মধ্যে ৪৭ জন এম.এল.এস.এস আউট সোর্সিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য। বর্তমানে সর্বমোট (৪৪+৩৩) = ৭৭ টি পদ শূন্য রয়েছে। ৬২

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৮৮১.৯৬ (আঠার কোটি একাশি লক্ষ ছিয়ানববই হাজার) লক্ষ টাকা।

অনুমোদিত কার্যাদেশের টাকার পরিমানঃ ৪.১৭ (চার লক্ষ সতের হাজার) লক্ষ টাকা।

কার্য সমাপ্তির সময়কাল: প্রশিক্ষণ কোর্স মেয়াদে কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৪.৪.২.৪ কারিগরি/বাস্তব কাজের খাতঃ

বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ যেমন-

১) সেলাই ও এমব্রয়ডারী,

২) ব্লক- বাটিক এন্ড স্ক্রীণ প্রিন্ট,

৩) সাবান ও মোমবাতি তৈরী,

৪) বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং,

৫) পোলট্রি উন্নয়ন,

৬) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ,

৭) চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী,

৮) নকশী কাঁথা ও কাটিং,

৯) মোবাইল ইঞ্জিনি/য়ারিং ও

১০) হাউস কিপিং

৪.৪.২.৫ বাস্তব অগ্রগতি:

১৩ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০১টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেদ্র চালু করা হয়েছে। শুরন্ন হতে মে/২০১২ পর্যন্ত ৩৬৩০ জন প্রান্তিক মহিলাকে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৫২০ জন প্রান্তিক মহিলার প্রশিক্ষণ চলছে। এছাড়া ২৯ জন সফল প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা মহিলাকে ক্ষুদ্রঋণ/আর্থিক সহায়তার আওতায় আনা হচ্ছে। উল্লেখ্য, চালুকৃত ১৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০১টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের কার্যক্রম শতভাগ অগ্রগতি হয়েছে।

৪.৪.২.৬ আর্থিক অগ্রগতিঃ

২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৩২.০০ (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং অবমুক্ত হয়েছে ১৩২.০০ (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ) লক্ষ টাকা । এই অর্থ বছরে মে/২০১২ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৪.৮৫ (চুরানববই লক্ষ পঁচাশি হাজার) লক্ষ টাকা। শুরু হতে মে/২০১২ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩২৬.১০ লক্ষ টাকা।

৪.৪.২.৭ মামলা সংক্রান্ত তথ্য

পূর্ব প্রকল্পে নিয়োজিত ১৭ জন নিগ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় তাদের নিয়োগ দানের জন্য একটি রীট মামলা দায়ের করেন। রীট মামলা নং-৪৭২০/২০০৯ দায়ের করার প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ দেয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটে। ফলে ৩৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা যায়নি এবং ৭৭টি পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ে আদালতে বিচারাধীন মামালার রায় হয়েছে। রায় মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।[62]

৪.৪.৩ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের নাম: অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় মহিলা সংস্থা

বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৫

৪.৪.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎপন্নজাত দ্রব্যের বিপণনের জন্য বাজার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা ও সুবিধাভোগী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-EPB, SME ফাউন্ডেশন, PKSF এবং অন্যান্য NGOs সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং তাদের প্রতিনিধির জন্য ১টি তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা হবে যাতে তারা দীর্ঘ মেয়াদি সুফল পায়।

৪.৪.৩.২ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৭৭৫০ জন মহিলাকে উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে ৫৫০০ জন বেকার মহিলাকে মূল স্রতোধারায় আনা ২২৫০ জন নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন নারী

[62] http://www.mowca.gov.bd Retrieved: ১১ মে, ২০১৮

উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণে সহায়তা হাতে কলমে শিক্ষাকে কাজে লাগাতে ১টি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন এবং ১টি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন সুবিধাভোগী ও অন্যান্য সংস্থা যেমন- EPB, SME foundation, PKSF এবং অন্যান্য NGO এর সাথে সংযোগ স্থাপন উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বাণিজ্য মেলা, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন স্থানীয় উদ্যোক্তা ও তাদের প্রতিনিধিদের জন্য একটি ডাটা ব্যাংক তৈরি করা নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও পলিসি তৈরিতে পদক্ষেপ গ্রহণ

প্রকল্প এলাকা: প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম,রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি কেন্দ্র (মোট ২৫টি প্রশিক্ষণ ইউনিট)

৪.৪.৩.৩ কার্যক্রম:

প্রকল্পের কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে বিভাগওয়ারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখানো হলো-

বিভাগ	প্রশিক্ষণ ট্রেড
ঢাকা	১। বিউটিফিকেশন ২। ক্যাটারিং ৩। ফ্যাশন ডিজাইন ৪। ইন্টেরিয়র ডিজাইন ৫। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ৬। পোটারি
চট্টগ্রাম	১। বিউটিফিকেশন ২। ক্যাটারিং ৩। ফ্যাশন ডিজাইন ৪। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ৫। পোটারি
খুলনা	১। বিউটিফিকেশন ২। ক্যাটারিং ৩। ফ্যাশন ডিজাইন ৪। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
রাজশাহী	১। বিউটিফিকেশন ২। ক্যাটারিং ৩। ফ্যাশন ডিজাইন ৪। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
বরিশাল	১। বিউটিফিকেশন ২। ক্যাটারিং ৩। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
সিলেট	১। বিউটিফিকেশন ২। ক্যাটারিং ৩। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট

জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট

৩জন	২জন	৪ জন	৩ জন	১২জন

৪.৪.৩.৪ প্রাক্কলিত ব্যয়:

২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট : ৩০০.০০ (লক্ষ টাকা)

২০১১-২০১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট : ২৮২.০০ (লক্ষ টাকা)

প্রাপ্ত বরাদ্দ: ২৮২.০০ (লক্ষ টাকা)

ব্যয়: ২২১.৩১ (মে ২০১২ পর্যমত্ম) (লক্ষ টাকা)

অনুমোদিত কার্যাদেশের টাকার পরিমাণ: ৫৪ লক্ষ টাকা

কার্য সমাপ্তির সময়কাল: ২২ মে ২০১২

৪.৪.৩.৫ কারিগরি/বাস্তব কাজের খাত:

- প্রশিক্ষণ
- নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ
- বেকার মহিলাদের প্রশিক্ষণ
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT)
- উৎপাদন কেন্দ্র
- বিক্রয় কেন্দ্র
- কর্মশালা

৪.৪.৩.৬ বাস্তব অগ্রগতি (ব্যর্থতা থাকিলে উহার কারণ উল্লেখসহ):

বেকার ও উদ্যোক্তা মহিলাদের ব্যবস্থাপনা এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য ছয়টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভাড়া করা হয়েছে । প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ফার্নিচার ও যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া ও সিলিং ফ্যান) ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয়ের সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকায় ক্যাটারিং এ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশ কে নির্বাচন করা হয়েছে এবং

বেকার মহিলাদের বিউটিফিকেশন, মৃৎ শিল্প, ফ্যাশন ডিজাইন, ক্যাটারিং (চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে), ইন্টেরিয়র ডিজাইন এবং উদ্যোক্তা মহিলাদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে একযোগে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫৫০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয় মহিলা সংস্থার স্থায়ী জনবলের মধ্যে থেকে ২৫ জন ট্রেড ইন্সট্রাক্টরকে মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে বর্ণিত ০৬টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের অবহিত করার জন্য ১১টি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৭টি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সহায়তা করার জন্য ঢাকা আমত্মর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১২ তে ষ্টল বরাদ্দ নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রীর সহায়তা করার জন্য ১০ দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলা সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৪.৪ জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৪.৪.৪.১ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের নাম: জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।

উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় মহিলা সংস্থা।

প্রকল্প পরিচালক: নাসরিন আক্তার (যুগ্ন-সচিব) ।

৪.৪.৪.২ প্রকল্পের পটভূমি

শিক্ষিত ও বেকার মহিলাদের কম্পিউটার ও তথ্য যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ২য় পর্যায় চলছে। শিক্ষিত ও বেকার মহিলারা প্রশিক্ষণ গ্রহন করে কম্পিউটার ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থে দেশের মোট ৩০টি জেলায়

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পূর্বে জুলাই-০২ থেকে ফেব্রু-২০০৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে মোট ১০টি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।[63]

৪.৪.৪.৩ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য

শিক্ষিত মহিলাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা; সর্বশেষ প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞানকে দেশজ টেকসই প্রযুক্তির সাথে প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মস্থ করা; শিক্ষিত বেকার মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা; নারী সমাজকে মানব সম্মদে পরিণত করার লক্ষ্যে ধ্যানধারণাগত পরিবর্তনে উৎসাহ যোগানো।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:		দেশের ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫০০০ হাজার শিক্ষিত মহিলাকে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।
প্রকল্পের এ ক্যাটাগরী কেন্দ্রসমূহ		ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, কুমিলা ও নারায়ণগঞ্জ।
প্রকল্পের বি ক্যাটাগরী কেন্দ্রসমূহ		ফরিদপুর, দিনাজপুর, নোয়াখালী, রংপুর, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, পাবনা, কুড়িগ্রাম, নাটোর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, নওগাঁ, গোপালগঞ্জ, ভোলা, গাজীপুর, পঞ্চগড় ও কক্সবাজার।
প্রকল্পের পুরাতন জেলা কেন্দ্রসমূহ		ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, ফরিদপুর ও দিনাজপুর।
বাস্তবায়নকাল		জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১২ ইং পর্যন্ত।

[63] http://www.mowca.gov.bd Retrieved: ২৩ জুলাই, ২০১৮

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :		১৬.৭৫৪৭ কোটি টাকা (জিওবি)

অর্থবছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
এডিপি'র বরাদ্দ	৬০০.০০	৬৮০.০০	৯৯২.০০	৩৮০.০০
আরএডিপি	৩৩৬.০০	৩৪৭.০০	২৫০.০০	-

২০০৮-০৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ		৬০০.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ৩৭২.০০ (রাজস্ব)+২২৮.০০(মূলধন)
সংশোধিত বরাদ্দ		৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ১৮৬.০০ (রাজস্ব)+১৫০.০০(মূলধন)
অবমুক্তি		৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ১৮৬.০০ (রাজস্ব)+১৫০.০০(মূলধন)
মোট ব্যয়		২৪৩.৫০ লক্ষ টাকা (মোট), ৯৩.৫৫(রাজস্ব)+১৪৯.৯৫ (মূলধন)
		৬৬
বাস্ত		লক্ষ্যমাত্রা- ৪১.০০%, অর্জিত- ২৪.৯৩%। আর্থিক অগ্রগতি- ৭২.৪৭%।
২০০৯-১০ অর্থ বছরের বরাদ্দ		৬৮০.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ৪৬৭.০০(রাজস্ব)+ ২১৩.০০ (মূলধন)
সংশোধিত বরাদ্দ		৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ২৪০.০০(রাজস্ব)+ ১০৭.০০ (মূলধন)
অবমুক্তি		৩৪৫.৭৫ লক্ষ টাকা (মোট), ২৩৯.২৫(রাজস্ব)+১০৬.৫০ (মূলধন)
ব্যয়		৩৩৮.৭৮ লক্ষ টাকা (মোট), ২৩২.২৯ (রাজস্ব)+১০৬.৪৯ (মূলধন)
বাস্তব		লক্ষ্যমাত্রা- ১৯.৪০%, অর্জিত- ৩৭.১৯%। আর্থিক অগ্রগতি- ৯৭.৬৩%।
২০১০-১১ অর্থ বছরের বরাদ্দ		৯৯২.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ৮৮৬.০০(রাজস্ব)+১০৬.০০(মূলধন)
সংশোধিত বরাদ্দ		২৫০.০০ লক্ষ টাকা
অবমুক্তি		২৪৮.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ২২১.৫০ (রাজস্ব)+২৬.৫০ (মূলধন)
ব্যয়		২৪২.৩৫৩৬৮ লক্ষ টাকা
বাস্তব		লক্ষ্যমাত্রা- ১৯.৪০%, অর্জিত- ১৭.৮৯%। আর্থিক অগ্রগতি- ৯৬.৯৪%।

২০১১-১২ অর্থ বছরের বরাদ্দ		৩৮০.০০ লক্ষ টাকা (মোট), ৩৮০.০০(রাজস্ব)।		
বাস্তব		লক্ষ্যমাত্রা- ১৯.২০%		
প্রশিক্ষণের অগ্রগতি		এ পর্যন্ত ১২০০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।		
সর্বমোট জনবল		১ম শ্রেণী (সরাসরি)	২য় শ্রেণী (সরাসরি)	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী (আউটসোর্সিং)
		৩১	৩২	৬৬

প্রকল্প পরিচালকজেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার

প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৪.৪.৫ তথ্য আপাঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প।

	চাহিত তথ্যের বিবরণ		তথ্যাবলী
১.	Summary of the Project Including estimated cost		তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষক্ষ্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পটি বাংলাদেশের গ্রামীন ও শহরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও কম সুযোগপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষক্ষ্য নিমণলিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে গৃহীত হয়েছে।সুযোগবঞ্চিত ও কম সুযোগপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়ণ;নির্বাচিত ১০টি উপজেলায় ১০টি তথ্য কেন্দ্র (Information Center) প্রতিষ্ঠা করা;এই ১০টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে এক লক্ষ মহিলাকে সচেতন ও

			উদ্বুদ্ধকরণ; একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরী করা যেখানে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে নারী ও শিশু, মহিলা উদ্যোক্তা,মহিলা বিষয়ক সংবাদ, সরকারি বিধি বিধান, মহিলা বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, আইনী সহায়তা, নারীর বিরম্নদ্ধে সহিংসতা ইত্যাদি। শুধুমাত্র নারী ও শিশু বিষয়ক সমস্যাদি ও তার প্রতিকার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি Central Women's Call-Center প্রতিষ্ঠা করা। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২০২.২৯ টাকা (বার কোটি দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার)। ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট : ৩৯০.৮৫ (তিন কোটি নববই লক্ষ পঁচাশি হাজার) ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট : ১৩৫.৭১ (এক কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার) প্রকল্পের মেয়াদঃ ০৭/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৪
২.	Approved amount of the work ordert		অফিস সরঞ্জামাদি খাতঃ ৬৮,১২,০০০আসবাবপত্র খাতঃ ২৫,২২,০০০
৩.	Time for completion of workt		৩০ জুন , ২০১২
৪.	Brief technical /Physical Component of the		তথ্য ভান্ডার / Comprehensive Database (Knowledge Bank): একটি সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে। এই তথ্য ভান্ডারে মহিলা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের মজুদ থাকবে। এ তথ্য ভান্ডারের প্রধান সুবিধা হল মহিলা বিষয়ক সকল

	workt		মূল্যবান তথ্যাবলী একটি প্রবেশযোগ্য সুনির্দিষ্ট স্থানে (Data Base) সংরক্ষণ। এই তথ্য ভান্ডারের আরো সুবিধা হল এই তথ্যসমুহ বিতরণ ও ব্যবহারে কোন অর্থ ব্যয় হবে না (খ) Information Center: দশটি উপজেলায় দশটি তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই তথ্য কেন্দ্র সমুহের দায়িত্বে থাকবেন তথ্য সহকারী এবং জুনিয়র তথ্য সহকারীগন। তথ্য সহকারী তথ্য কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন এবং জুনিয়র তথ্য সহকারী সংশিষ্ট এলাকার মহিলাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও এর সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ঘরে ঘরে পরিদর্শনের কাজে নিয়োজিত থাকবেন। প্রতিমাসে ৪৫০-৫০০ পরিবারে গমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। (গ) Web Portal for women: প্রকল্পের প্রথম বৎসর মহিলাদের জন্য একটি Web Portal স্থাপন করা হবে। এটি আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে অভিজ্ঞ IT Company কর্তৃক ডিজাইন করা হবে। ওয়েব পোর্টালের মূল উপজীব্য হবে নারী। নারী সম্পর্কিত নানান ঘটনা, বিষয়াবলী, নারী নীতি এবং নারীকেন্দ্রিক তথ্য প্রবাহ – এ সবই হবে এই ওয়েব পোর্টালের মূখ্য বিষয়। (ঘ) Central call Center : নারী ও শিশুদের জন্য সঠিক সময়ে দ্রুততার সাথে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি একটি চলমান সমস্যা। এই সমস্যা দূরীকরণে প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হবে একটি কল সেন্টার। চার সংখ্যার একটি Hotline নম্বরে ফোন করার মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থান থেকে যে কেউ এই কল সেন্টারের সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। একসাথে পাঁচ জন সেবা-গ্রহীতাকে সেবা প্রদান করার মত সুবিধা কল সেন্টারটিতে থাকবে। কল সেন্টারের প্রধান সুবিধা হবে এই যে, সেবা গ্রহীতা সশরীরে হাজির না হয়েও কোন রকম সংকোচ ছাড়াই তার/তাদের সকল

			ধরনের ব্যক্তিগত সমস্যাদি বিষয়ে সমাধান চাইতে সক্ষম হবেন।(ঙ) উইমেন টিভিঃ প্রকল্পের আওতায় যে ওয়েব পোর্টাল তৈরী করা হবে সেখানে যোগ করা হবে একটি অন লাইন টিভি (উইমেন টিভি)। যার মূল উপজীব্য হবে নারী সংক্রামত্ম বিষয়াবলী। উইমেন টিভিতে একটি ভিডিও এবং স্থির চিত্রের সংগ্রহশালা। (চ) Information through mobile phone: মোবাইল ফোনের ব্যবহার এখন সর্বত্র। তাই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বল্প খরচে এবং কার্যকরীভাবে তথ্য সেবা প্রদান সম্ভব। কল সেন্টারের সেবা গ্রহণের জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবহার ছাড়াও বিশেষায়িত মোবাইল এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরীর মাধ্যমে স্বল্প খরচে এসএমএস (টেক্সট) ভিত্তিক তথ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মৌলিক ধরনের তথ্য চাহিদা যেমন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, জরুরী খবর, সাধারন জ্ঞান, কৃষি তথ্য, রান্না-বান্না ইত্যাদি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেটানো সম্ভব হবে।
৫	Progress of implementation of project including causes of failure (If any)) t		প্রযোজ্য নয়।

৪.৪.৬ প্রকল্পের নাম: জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স প্রকল্প।

উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় মহিলা সংস্থা ।

বাস্তবায়নকাল: জুলাই /২০১১ হতে ডিসেম্বর /২০১৩

৪.৪.৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্তকরণ ।

প্রকল্পের সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য:

১) পাঁচ জেলায় পাঁচটি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।

২) কমপ্লেক্স ভবনে অনগ্রসর মহিলাদের ট্রেনিং ।

৩) কমপ্লেক্স ভবনের অডিটোরিয়াম সেমিনার ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা।[64]

প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নড়াইল, ও দিনাজপুর ।

কার্যক্রম: পাঁচটি জেলায় পাঁচটি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ।

জনবল সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্প পরিচালক– ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর – ১ জন, ও এম এল এস এস – ১ জন।

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০১১ – ১২ অর্থ বৎসরের বাজেট ৩(তিন) কৌটি। ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট

১৯ (উনিশ) লক্ষ

প্রাপ্ত বরাদ্দ:

ব্যয়:

অনুমোদিত কার্যাদেশের টাকার পরিমান:

কার্য সমাপ্তির সময়কাল:

কারিগরি/বাস্তর কাজের খাত:

[64] http://www.mowca.gov.bd Retrieved: ২৪ আগস্ট, ২০১৮

৪.৪.৭ জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা নীতিমালা

হোস্টেলের নামঃ শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ঢাকা ।

৪.৪.৭.১ পটভুমিঃ

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিক সংখ্যক মহিলা জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান অনস্বীকার্য। জাতীয় মহিলা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের অংশ হিসেবে কমপ্লেক্স প্রকল্পের আওতায় ২০০৭ সালের মার্চ থেকে একটি কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল চালু হয়। ঢাকা মহানগরীতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের চাহিদা ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্চে। কর্মজীবী মহিলাদের স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ আবাসিক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা কমপ্লেক্স ভবনে প্রকল্পের আওতায় ৯ম-১২ তলায় ২০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়।[65]

৪.৪.৭.২ হোস্টেল পরিচালনা পদ্ধতিঃ

জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত শহীদ আইভী রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এর আয় হতে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে । এ হোস্টেল পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি ও পরিচালনা কমিটি থাকবে। নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবেঃ

৪.৪.৭.৩ উপদেষ্টা কমিটি

(১)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	চেয়ারম্যান , জাতীয় মহিলা সংস্থা	সহ সভাপতি

[65] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫, বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা

(৩)	যুগ্ম - সচিব (সেল) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	নির্বাহী পরিচালক , জাতীয় মহিলা সংস্থা	সদস্য
(৫)	সদস্য পরিচালনা পরিষদ, (জামস কর্তৃক মনোনীত সদস্য) জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৬)	পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৭)	উপ পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৮)	হোস্টেল সুপার, শহীদ আইভী রহমান কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল, বেইলী রোড,ঢাকা।	সদস্য
(৯)	সহকারী পরিচালক, প্রকল্প। জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য সচিব

৪.৪.৭.৪ উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ক) কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল পরিচালনার নীতি নির্ধারণ/পরামর্শদান/বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট অনুমোদন ।

খ) হোস্টেলের ষান্মাসিক / বার্ষিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান।

গ) হোস্টেলের উন্নয়ন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ।

উপদেষ্টা কমিটির সভাঃ

ক) বৎসরে দুইবার এই কমিটির সভা হবে।

খ) নূন্যতম ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে ।

গ) উপদেষ্টা কমিটি প্রয়োজনে জরুরী সভায় মিলিত হতে পারবেন ।

ঘ) সভাপতির অবর্তমানে তার সস্মতিক্রমে কমিটির কোন জ্যেষ্ঠ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

পরিচালনা কমিটিঃ

(১)	নির্বাহী পরিচালক জাতীয় মহিলা সংস্থা	সভাপতি
(২)	উপ-সচিব (সেল) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)	নির্বাহী কমিটির সদস্য , (জামস কতৃর্ক মনোনীত সদস্য) জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৪)	পরিচালক , জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৫)	উপ পরিচালক , জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৬)	সহকারী পরিচালক, প্রকল্প। জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৭)	সহকারী পরিচালক, হিসাব ও অর্থ। জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
(৮)	হোস্টেল সুপার শহীদ আইভী রহমান কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল, বেইলী রোড,ঢাকা।	সদস্য- সচিব

৪.৪.৭.৫ পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ক) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং উপদেষ্টা কমিটিতে তা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ সহ উপস্থাপন ।

খ) প্রতি ৩ মাস অন্তর পরিচালনা কমিটির সভায় উপস্থাপনার মাধ্যমে বার্ষিক বরাদ্দের বিপরীতে অয় ব্যয় পর্যালোচনা।

গ) হোস্টেলের জনবল সংক্রান্ত বিষয় যেমন পদ সৃষ্টি, পদ বিলুপ্তি, জনবল হ্রাস / বৃদ্ধি, জনবলের বেতন নির্ধারণ ও নিরীক্ষা এবং কার্যক্রম মূল্যায়ন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ।

ঘ) হোস্টেলের সীট বরাদ্দ ,সীট বাতিল , সীটভাড়া , সীট সংখ্যা বৃদ্ধি ও যাবতীয় ফি পর্যালোচনা ও পূনঃনির্ধারণ /বৃদ্ধি করার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ।

ঙ) সরকারী বিধি বিধান মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ।

P) নীতি নির্ধারণের বিষয়সমূহ উপদেষ্টা কমিটির নিকট উপস্থাপন ।

পরিচালনা কমিটির সভাঃ

(ক)	পরিচালনা কমিটির সভা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রয়োজনের জরুরী সভা আহবান করা যাবে।
(খ)	সভাপতির অনুপস্থিতে তাঁর অনুমতিক্রমে সংস্থার পরিচালক জরুরী সভা পরিচালনা করবেন।
(গ)	নূন্যতম ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

সম্মানী ভাতা

হোস্টেল উপদেষ্টা ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সভায় উপস্থিতির জন্য সদস্যদের নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করা যাবে।

৪.৪.৮ হোস্টেলের তহবিল

তহবিলের নামঃ শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল তহবিল , ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা ।

৪.৪.৮.১ তহবিলের উৎস

ক) হোস্টেলের সকল প্রকার আয়।

খ) সরকারী মঞ্জুরী অনুদান।

গ) বে-সরকারী ও ব্যক্তিগত অনুদান/দান ।

৪.৪.৮.২ তহবিল গঠন

হোস্টেলের সমুদয় আয় তফসিল ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা থাকবে। হোস্টেল পরিচালনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে হোস্টেল পরিচালনার জন্য এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।[66]

[66] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

৪.৪.৮.৩ তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি

নির্বাহী পরিচালক জাতীয় মহিলা সংস্থা ও সহকারী পরিচালক (প্রকল্প),জাতীয় মহিলা সংস্থা এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

৪.৪.৮.৪ হোস্টেলের সঞ্চয়

ক) হোস্টেলের সাশ্রয়কৃত অর্থ মুনাফা হিসেবে স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদে সঞ্চয় করা যাবে।

খ) উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক হোস্টেলের মুনাফা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার অধিক হলে এফ ডি আর করা যাবে।

গ) এফ ডি আর এর মুনাফার ১০% হোস্টেলের আয়ের হিসেবে জমা হবে।

ঘ) হোস্টেলের ব্যয় সম্পর্কিত যে কোন প্রয়োজনে এফ ডি আর ভাঙ্গানো যাবে।

৪.৪.৮.৫ হোস্টেলের সম্পদের দায়ভার

হোস্টেলের অর্জিত সকল জনবল সহ হোস্টেলের সকল সম্পদ জাতীয় মহিলা সংস্থার মালিকানায় থাকবে এবং সরকারী প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।[67]

৪.৪.৮.৬ হোস্টেলের জনবল

- শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী জাতীয় মহিলা সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে।
- শহীদ আইভী রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণএই নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবেন।
- হোস্টেলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সংস্থার বিদ্যমান আইন ও চাকুরী বিধি প্রযোজ্য হবে।
- প্রয়োজনে হোস্টেল পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে দৈনিক ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করা যাবে।[68]

---

[67] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

[68] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

৪.৪.৮.৭ হোস্টেলে ভর্তির যোগ্যতা

ক) ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী ,স্বায়ত্বশাসিত, বিধিবদ্ধ সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেলের ১৩তম/ সমমানের গ্রেড অথবা তদুর্দ্ধে কর্মরত মহিলাগণ এই হোস্টেলে বসবাস করার জন্য আবেদন করতে পারবেন ;

খ) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি হতে হবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় এইচ এসসি হতে পারে;

গ) প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ;

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম স্নাতক, বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য ।

ঙ) তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

ঙ) বোর্ডারকে হোস্টেলে এককভাবে থাকতে হবে।

৪.৪.৮.৮ শর্তাবলী

ক) সীট সংখ্যা অনুযায়ী বোর্ডারদের যোগ্যতা যাচাইপূর্বক ভর্তির জন্য সুপারিশ করা হবে।

খ) ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থী/ বোর্ডারকে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর, ফিস প্রদান ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হোস্টেলে ভর্তি হতে হবে।

গ) মাসের যে কোন সময়ে ভর্তি হলে মাসের পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

ঘ) সীট বরাদ্দ পত্র জারীর ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফিস প্রদান পূর্বক হোস্টেলে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সীট বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) হোস্টেলে ভর্তির সময় এককালীন ভর্তি ফিস, আনুসঙ্গিক ব্যয়, তিন মাসের অগ্রীম সীট ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় রশিদের বিনিময়ে জমা দিতে হবে।

চ) প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে সীট ভাড়া হোস্টেলের দপ্তরে রশিদের বিনিময়ে জমা দিতে হবে।

ছ) নির্ধারিত সময়ে মাসিক সীট ভাড়া প্রদান না করলে উক্ত তারিখের পর হতে প্রতি মাসের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা জরিমানা দিতে হবে।

জ) কোন কারণে হোস্টেলে অবস্থান না করলেও যথারীতি সীট ভাড়া প্রদান করতে হবে।

ঝ) শারীরিক অসুস্থতা , চাকুরী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ , ট্যুর ইত্যাদি কারণে সীট ভাড়া যথারীতি প্রদান পূর্বক সর্বোচ্চ দুই মাসের জন্য সীট সংরক্ষিত রাখা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হলে বরাদ্দকৃত সীট বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঞ) একাধারে ০৩ (তিন) মাসের সীট ভাড়া পরিশোধ না করলে হোস্টেল পরিচালনা কমিটি বিনা নোটিশে সমুদয় পাওনা গ্রহণ অথবা জামানত সহ তিন মাসের সীটভাড়া এবং অন্যান্য ভাড়া ও মালামাল বাজেয়াপ্ত করে বরাদ্দকৃত সীট বাতিল করে দিতে পারবেন।

(ট) সীট বরাদ্দের ২(দুই) মাসের মধ্যে বোর্ডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সীট বাতিল করা হলে কোন প্রকার জামানত সহ অগ্রিম দেয়া হবে না। জামানত সহ ৩(তিন)মাসের অগ্রীম সীট ভাড়া বাজেয়াপ্ত করে বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

৪.৪.৮.৮ ভর্তির নিয়মাবলী

ক) বোর্ডারদের ভর্তির জন্য আবেদন নির্ধারিত ফরমে করতে হবে। নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে।

খ) সত্যায়িত কপি প্রদান করে নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে নির্ধারিত (পরিশিষ্ট -ক) আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

গ) প্রার্থী যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, সে প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পত্রসহ বেতন আহরণের প্রমাণপত্র জমা করতে হবে।

৪.৪.৮.৯ বোর্ডার বাছাই ও ভর্তিঃ

K) প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত আবেদন পত্র সমূহ হোস্টেল সুপার যাচাই বাছাই করে সীট বরাদ্দ কমিটির কাছে পেশ করবেন । সীট বরাদ্দ কমিটি সুপারিশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খ) প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে নূন্যতম ৫টি আবেদন পাওয়ার প্রেক্ষিতে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৪.৪.৮.১০ ভর্তি প্রক্রিয়া ও সীট বরাদ্দঃ

সীট বরাদ্দ কমিটিঃ

১।	পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা	সভাপতি

২।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
৩।	সহকারী পরিচালক (প্রকল্প) জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
৪।	তত্ত্বাবধায়ক, শহীদ আইভী রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ।	সদস্য – সচিব।

সীট বরাদ্দ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ক) সীট বরাদ্দের আবেদনসমূহ পুনঃ পরীক্ষা করা।

খ) আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আবেদনের সাথে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই।

গ) সীট বরাদ্দের সুপারিশ অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.৪.৮.১১ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ক) প্রতি মাসের সীট ভাড়ার সাথে খাবারের কুপন ক্রয় করতে হবে। কুপনের হার পরিবর্তনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবেন।

খ) সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুযায়ী খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে।

গ) হোস্টেল পরিচালনা কমিটির অনুমোদনক্রমে খাবারের মেনু এবং মূল্য নির্ধারিত হবে এবং সেই অনুসারে খাবারের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হোস্টেল সুপার কর্তৃক পরিচালিত হবে।

গ) খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বোর্ডার প্রতিনিধিগণ রোটেশনালী দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) হোস্টেল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অনুসারে খাবারের সময়সূচী নির্ধারণ করা হবে।

ঙ) হোস্টেল কক্ষে পৃথক ভাবে রান্না করে খাওয়া যাবে না। প্রত্যেক বোর্ডার ডাইনিং রুমে খাবার খাবেন।

৪.৪.৮.১২ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

১।	সহকারী পরিচালক (প্রকল্প) জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সভাপতি
২।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা , জাতীয় মহিলা সংস্থা।	সদস্য
৩।	বোর্ডারদের প্রতিনিধি , শহীদ আইভী রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল	সদস্য
৪।	হোস্টেল সুপার , শহীদ আইভী রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল	সদস্য সচিব।

৪.৪.৮.১৩ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ক) সময়ে সময়ে খাবারের মান যাচাই।

খ) খাবারের বিষয়ে বোর্ডারদের আনা অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) কুপনের বিপরীতে সংগৃহীত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করা।

টেন্ডার কমিটি:

ক)	নির্বাহী পরিচালক , জাতীয় মহিলা সংস্থা	সভাপতি
খ)	নির্বাহী কমিটির সদস্য , জাতীয় মহিলা সংস্থা	সদস্য
গ)	পরিচালক , জাতীয় মহিলা সংস্থা	সদস্য
ঘ)	সিনিয়র সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঙ)	সহকারী পরিচালক (প্রকল্প) , জাতীয় মহিলা সংস্থা	সদস্য
চ)	সহকারী পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) , জাতীয় মহিলা সংস্থা	সদস্য
ঙ)	হোস্টেল সুপার	সদস্য সচিব

টেন্ডার কমিটির দায়িত্বঃ

K) বিজ্ঞপ্তি দরপত্র প্রকাশ;

L) তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতকরণ;

M) চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সুপারিশকরণ।

৪.৪.৮.১৪ স্টেলে বিদ্যমান সুবিধাদি

ক) হোস্টেলের প্রত্যেক বোর্ডারের ব্যবহারের জন্য হোস্টেল কক্ষে প্রয়োজনীয়াসবাব বরাদ্দ করা হবে।

খ) বরাদ্দকৃত হোস্টেল কক্ষে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে টিভি, ডিশ লাইন ইস্ত্রি, হিটার কেরোসিন চুলা বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বোর্ডার কর্তৃক রাখা যাবে না। অবৈধভাবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হারে হারে জরিমানা করা হবে।

গ) কোন ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি বোর্ডার কর্তৃক রাখা যাবে না।

ঘ) বোর্ডারগণের মূল্যবান সামগ্রী তাঁর নিজ দায়িত্বে রাখতে হবে।

ঙ) কমন রুমে ওয়াশিং মেশিন ও দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থা করা হবে।[69]

৪.৪.৮.১৫ বোর্ডারের সাক্ষাৎ প্রার্থী

ক) হোস্টেল বোর্ডারগণের একজন করে দায়িত্বশীল স্থানীয় অভিভাবক থাকবেন। যার সাথে (জরুরী অবস্থায়) যে কোন প্রয়োজনে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করবেন।

খ) স্থানীয় সাক্ষাৎকার প্রার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩ জন হবে এবং মূখ্য অভিভাবক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

গ) হোস্টেলের বোর্ডারগণ হোস্টেলের নির্ধারিত স্থানে সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন (হোস্টেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত) সকাল ৯.০০টা হতে ১২ টা এবং বিকাল ৪.০০টা হতে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত অনুমোদিত সাক্ষাত প্রার্থীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারবেন।

[69] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৮ মে, ২০১৮

ঘ) কোন সাক্ষাত প্রার্থী তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানের বাইরে বোর্ডারগণের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারবেন না (২য় তলার বেলকনিতে অস্থায়ীভাবে সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য স্থান নির্ধারিত রয়েছে)।

ঙ) কোন সাক্ষাত প্রার্থী বোর্ডারগণের কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রবেশ করতে পারবেন।[70]

৪.৪.৮.১৬ বোর্ডারদের করণীয়

ক) হোস্টেলে অবস্থানরত বোর্ডারদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হোস্টেল ত্যাগ ও হোস্টেলে প্রবেশ করার নির্দেশাবলী এবং নিয়মাবলী পালন করতে হবে ।

খ) বোর্ডার কক্ষে অতিথি রাখা যাবেনা। অনুচ্ছেদ ১০ এর 'খ' এ বর্ণিত সরঞ্জাম কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা যাবেনা।

গ) হোস্টেলের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডারগণকে হোস্টেলে প্রবেশ করতে হবে।

ঘ) বোর্ডারগণকে হোস্টেল পরিচালনার নীতিমালা অনুযায়ী অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করতে হবে ।

ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পর লিখিত অনুমতি ছাড়া হোস্টেলের বাইরে থাকতে পারবেন না।

চ) বহিরাগমন ও আগমনের সময় লিপিবদ্ধ করার জন্য রিসেপশনে রেজিষ্টার বই থাকবে।

৪.৪.৮.১৭ চিত্তবিনোদন/বিভিন্ন দিবস পালন

ক) চিত্তবিনোদনের জন্য সাধারন কক্ষে টেলিভিশনসহ বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা থাকবে। ৩টি দৈনিক পত্রিকা (২টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী) এবং লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রয়েছে।

খ) বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনে যেমনঃ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস,বিজয় দিবস, মহান ভাষা দিবস,ঈদ-ই মিলাদুন্নবী,আন্তজার্তিক নারী দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস পালনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বোর্ডারগণ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

[70] http://www.mowca.gov.bd, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫, বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা

৪.৪.৮.১৮ বোর্ডারদের বহিস্কারকরণ

নিম্নবর্ণিত কারণে একজন বোর্ডারকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হোস্টেল হতে বহিস্কার করা যাবেঃ

ক) এই হোস্টেলে অবস্থানকালীন সময়ে বোর্ডারগণ কোন রাজনৈতিক দলের সভা, সমিতি,কমিটি গঠন ও কোন প্রকার আন্দোলন করলে ;

খ) হোস্টেলের ভিতর অথবা বাইরে শান্তি শৃংখলা পরিপন্থী কার্যকলাপ এবং নৈতিকতা বিরোধী ও অশোভন আচরণের জন্য;

গ) সংক্রামক, দূরারোগ্য এবং মানসিক অসুস্থতা ও প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এমন ব্যাধির জন্য ।

ঘ) ধুমপান, নেশা জাতীয় কোন ঔষধ / দ্রব্য সেবন অথবা গ্রহণ করলে, বে-আইনী / অবৈধ কোন মালামাল পাওয়া গেলে হোস্টেলের সীট বাতিল করা হবে।

ঙ) ছোঁয়াচে / সংক্রামক (যেমন, খোঁস পাচরা , বসন্ত, হাঁচি-কাঁশি) দূরারোগ্য ব্যাধির কারণে কোন বোর্ডারকে সাময়িকভাবে হোস্টেল হতে বাইরে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হলে রোগমুক্তির পর সংশিষ্ট বোর্ডারগণকে পুনরায় হোস্টেলে ভর্তি করা যাবে।

৪.৪.৮.১৯ হোস্টেল ত্যাগ সংক্রান্ত

ক) প্রতিদিন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত হাজিরা গ্রহণ করা হবে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া একাধারে ৩(তিন) দিন হাজিরা প্রদান না করলে স্থানীয় অভিভাবককে অবহিত করে সীট বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) যে কোন সময়ের জন্য হোস্টেলের বাইরে রাত্রি যাপন অথবা যে কোন মেয়াদের জন্য হোস্টেলের বাইরে থাকতে হলে হোস্টেল সুপারকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

গ) কোন বোর্ডার কর্তৃক স্বেচ্ছায় সীট খালি করতে হলে কমপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে লিখিত ভাবে জানাতে হবে। অন্যথায় ৩০ দিনের সীট ভাড়া প্রদান করতে হবে।

ঘ) বোর্ডারগণকে হোস্টেল ত্যাগকালীন সময়ে যাবতীয় দেনা পাওনা পরিশোধ করা আছে মর্মে উলেখপূর্বক হোস্টেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হোস্টেল ত্যাগের ছাড়পত্র নিতে হবে।

১৬। হোস্টেলের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে। কর্তৃপক্ষ এ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৪.৪.৯ ডে-কেয়ার সেন্টার

৪.৪.৯.১ পটভূমি

ঢাকাস্থ ১৪৫, নিউ বেইলী রোডে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থা কমপ্লেক্স ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের অংশ হিসেবে কমপ্লেক্স প্রকল্পের আওতায় ২০০২ সালের আগষ্ট থেকে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। তখন থেকে এটি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

৪.৪.৯.২ ডে-কেয়ার সেন্টার এর কমিটিসমূহ

জাতীয় মহিলা সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত একটি পরিচালনা কমিটি থাকবেঃ

কমিটির রূপরেখা

ক) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা- উপদেষ্টা

খ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা- সভাপতি

গ) নির্বাহী কমিটির সদস্য (১ জন)- সদস্য

ঘ) পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা- সদস্য

ঙ) সহকারী পরিচালক (প্রকল্প), জাতীয় মহিলা সংস্থা- সদস্য

চ) ডে-কেয়ার ইনচার্জ, জাতীয় মহিলা সংস্থা- সদস্য সচিব[71]

৪.৪.৯.৩ কার্যপরিধি

ক) ডে-কেয়ার সেন্টার এর নীতি নির্ধারণ/পরামর্শদান/বার্ষিক বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

[71] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

খ) ডে-কেয়ার সেন্টার এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ) উপদেষ্টার সম্মতিক্রমে সভাপতি সভা আহবান করবেন এবং সভাপতিত্ব করবেন।

ঘ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনও সময়ে জরুরী সভায় মিলিত হতে পারবেন।

ঙ) পরিচালনা পরিষদের সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

৪.৪.৯.৪ মনিটরিং কমিটিঃ

জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার নিয়মিতভাবে তদারকির জন্য নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি হবেঃ

ক) পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা- সভাপতি

খ) সহকারী পরিচালক (প্রকল্প) জাতীয় মহিলা সংস্থা- সদস্য

গ) পরিদর্শন কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থা- সদস্য

ঘ) ডে-কেয়ার ইনচার্জ, জাতীয় মহিলা সংস্থা- সদস্য-সচিব

৪.৪.৯.৫ কার্যপরিধি

ক) শিশু ভর্তির আবেদনপত্র আহবান, বাছাই ও নির্বাচন।

খ) কমিটি মাসে দু'বার সরেজমিনে পরিদর্শন করবে।

গ) পরিচালনা কমিটিতে উল্লিখিত সকল বিষয়ের সমস্যাবলী ও সুপারিশ পেশ করবে।

ঘ) অভিভাবকদের সাথে mother's day আয়োজনের ব্যবস্থা করবে।[72]

৪.৪.৯.৬ ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশু ভর্তির নিয়মাবলীঃ

- কর্মজীবি মাতা/অভিভাবক যারা সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কিংবা পেশাজীবী হিসাবে কর্মরত আছেন তাঁদের শিশুরা সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে ডে-কেয়ার সেন্টারে ভর্তির উপযোগী হবেন।

[72] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

- কেন্দ্রে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ভর্তি ফরমে আবেদন করতে হবে। শিশু ভর্তির জন্য অফেরতযোগ্য ভর্তি ফি এবং প্রতি মাসের নির্ধারিত বেতন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। বিলম্বে ফি প্রদানের জন্য জরিমানা বাবদ ৫০/- টাকা প্রদান করতে হবে।
- ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুর অবস্থান হবে সকাল ৮.৩০ টা থেকে বিকাল ৫.৩০টা পর্যন্ত। তবে কোন কারণে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। ডে-কেয়ার ইনচার্জ ডে-কেয়ার সেন্টার বন্ধ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিশুদের প্রস্থান নিশ্চিত করবেন।
- সাময়িকভাবে কোন শিশু ডে-কেয়ার সেন্টারে অবস্থান করতে চাইলে নিয়মিত শিশুদের ন্যায় যাবতীয় নিয়ম নীতি পালন করতে হবে।
- শিশুর বয়স হবে এক বছর থেকে ছয় বছর এবং বিশেষ বিবেচনায় সাত বছর পর্যন্ত।
- কেন্দ্র থেকে শিশুদের জন্য কোন খাবার সরবরাহ করা হবে না। তবে শিশুদের জন্য ফুটানো পানি ফিল্টারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।
- (ক) শারীরিক কিংবা মানসিক ভাবে অসুস্থ শিশুরা কেন্দ্রে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- সাময়িক অসুস্থ শিশু ও ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত শিশুকে নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ডে-কেয়ার সেন্টারে আনা যাবে না। এই বিষয়ে মনিটরিং কমিটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও অভিভাবককে অবহিত করবেন।
- অভিভাবকগণ প্রয়োজনীয় পোষাক ও আনুসাঙ্গিক (Diapers/napkins/অতিরিক্ত পোষাক) সরবরাহ করবেন।
- প্রতিদিন শিশুর সাথে খাবার টিফিন বক্সে দিতে হবে। শিশুখাদ্য বয়োসপযোগী এবং স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে।
- কেন্দ্র থেকে শিশুকে গোসলের কোন ব্যবস্থা করা হবে না। তবে বিশেষ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে স্বল্প সংখ্যক শিশুদের জন্য গোসলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- সকাল ৮.৩০ টার ভিতর অভিভাবক নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করে শিশুকে ডে-কেয়ার ইনচার্জের নিকট বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন এবং বিকাল ৬.০০ টার মধ্যেই রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করে ইনচার্জের নিকট থেকে ফেরৎ নিয়ে যাবেন।
- শিশুকে আনা এবং নেয়ার জন্য সংশিষ্ট মা/অভিভাবক ব্যতীত অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলে তার পরিচয়ের কাগজপত্র জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিশুকে ফেরৎ নিতে হবে। জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য অভিভাবকের সেল ফোন/ল্যান্ড ফোন নম্বর/পাসপোর্ট প্রদান করতে হবে।
- জামস কমপ্লেক্স ভবনে বিদ্যমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের একাংশের অবস্থান ৯ম তলায় অবস্থিত ডে-কেয়ার সেন্টারের নিকটবর্তী হোস্টেলের নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসী রক্ষার্থে অভিভাবকগণ রিসেপশন কাউন্টারে রাখা ইন্টারকমের মাধ্যমে ডে-কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ পূর্বক শিশুদের হস্তান্তর এবং গ্রহণ করবেন।
- ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের অবস্থানকালে সেন্টারে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যতীত কোন অভিভাবক বা অভিভাবকের প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ডে-কেয়ার সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন না। কেবলমাত্র মাসিক বেতন/ভর্তি সংক্রান্ত কোন কাজে অথবা শিশুদের শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে মহিলা অভিভাবকগণ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন।
- সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত কেন্দ্র চালু থাকবে।
- কেন্দ্রে ৪-৬ বছরের শিশুকে স্বাস্থ্য সহকারী শিক্ষক কর্তৃক প্রি-স্কুল (অক্ষরজ্ঞান-বাংলা ও ইংরেজী, সংখ্যা গণনা, ছড়া, কবিতা, গল্প বলা ইত্যাদি) শিক্ষা দেয়া হবে।[73]

[73] http://www.mowca.gov.bd *Retrieved:* ২৩ মে, ২০১৮

পঞ্চম অধ্যায়

নারীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় মহিলা সংস্থার অবদান

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেবাদানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নারী অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা। বাংলাদেশের সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অনুযায়ী বিভিন্নভাবে নারীরা নিজেদের অধিকারে সামিল হতে পারছে জাতীয় মহিলা সংস্থার জন্যই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। সাংবিধানিক অধিকার ও আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা জানা থাকলে আমাদের উপলব্ধি করতে সহজ হবে যে নারীদের উন্নয়নে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

৫.১ নারীর অধিকার ও আইন বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচি

নারীর অধিকারের প্রশ্নে সাংবিধানিক ও আইনগত জোড়ালো সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকার কারণে আমাদের সমাজে নারীদের এখনো সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিদিনই অসংখ্য নারীর মানবাধিকার হরণ হচ্ছে, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে এবং নারীর অধিকারহীনতা ও অসহায়ত্ব বেড়ে চলেছে।

আমাদের দেশে নারীদের অধিকার সচেতনতার অভাব এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োগগত সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা একদিকে যেমন তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ এবং আইনী সহায়তা প্রাপ্তির সুফল থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে বৈষম্যমূলক আইনের উপস্থিতি তাদের অবস্থাকে আরো বেশি নাজুক করে তুলছে। এই বাস্তবতায় নারীদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ যৌতুক, বাল্যবিবাহ, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ, উত্যক্তকরণসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ

প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে নারীনেত্রীদের নারীর অধিকার ও আইন বিষয়ক শিক্ষা দিয়ে থাকে।[74] যেসব আইনী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)
- যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
- মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রীকরণ) আইন, ১৯৭৪
- মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রীকরণ) বিধিমালা, ১৯৭৫
- মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
- মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯
- বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন. ১৯২৯
- বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন খসড়া (২০১৪)
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন, ২০১০।[75]

৫.২ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারী: বাংলাদেশ ও ভারতের আইনি চিত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭-এ বলা হয়েছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। অনুচ্ছেদ ২৮(২)-এ বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবতা আজ ভিন্ন। হিন্দু সমাজে নারীরা আজ শোষিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে, যা তাদের পথচলাকে বিঘ্নিত করছে, তাদের মানসিকতা বিপর্যস্ত হচ্ছে। ফলে নারীরা আজ অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছে।

---

[74] সুফিয়া কামাল, একালে আমাদের কাল, জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৮। সুফিয়া কামাল, মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয়, সময় প্রকাশন, বইমেলা, ২০০১।

[7575] https://bikoshitonari.net *Retrieved:* ২৩ মার্চ, ২০১৮

নারীদের বিরুদ্ধে সব রকম বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনে (সিডো) বাংলাদেশ অনুমোদন দিয়েছে ৬ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে। আন্তর্জাতিক এ আইনের অনুচ্ছেদ ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। এ আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার নারী অধিকার নিশ্চিত করতে আইনিভাবে বাধ্য। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৫৬-এর ভাষ্যমতে, লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য রুখে দিতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের তাই আন্তর্জাতিক আইনে বাধ্যবাধকতা জন্মেছে নারীদের বিরুদ্ধে সব বৈষম্য বন্ধ করতে। আইএলও কনভেনশনের অধীনেও বাংলাদেশ নারীদের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য।[76]

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন, ১৯২৫-এর ৮ নং অনুচ্ছেদে। যদি কোনো হিন্দু পুরুষ তার জীবদ্দশায় দলিল অথবা উইলের মাধ্যমে সম্পত্তি বণ্টন করতে নাও পারে তাহলে ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইনের ৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তালিকা অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বণ্টিত হবে। এর মাধ্যমে হিন্দু বিধবারা স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ দাবি করতে পারে। হিন্দু বিবাহ আইনের ২৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, হিন্দু ডিভোর্সড নারী পূর্বের স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ বাবদ ভাতা পাওয়ার অধিকারী। আরো বলা হয়েছে, যদি ডিভোর্সড মহিলারা পুনরায় বিয়ে না করে, ব্যাভিচারে নিয়োজিত না হয় এবং পর্যাপ্ত উপার্জন করতে না পারে তাহলে সে সারাজীবন পূর্বের স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ-ভাতা পাওয়ার অধিকার রাখে।[77] ভারতে এভাবেই নারীদের সীমিত অধিকার ব্যাপকতা পেয়েছে এবং তাদের সীমিত সম্পত্তি নিরঙ্কুশ সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমপ্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট পিতার অবর্তমানে নিয়োজিত চাকরিতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও সমানভাবে যোগ্য ঘোষণা করেছে।[78]

---

[76] অগাস্ট বেবেল। নারীঃ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। কলকাতা, ১৯৮৩।

[77] *Kalhan, Promilla. Women in films. (The Hindustan Times, 27 June, 1983)*

[78] ভারতীয় উত্তরাধিকারী আইন, ১৯২৫

ভারতে অঞ্চলভেদে নারীর উত্তরাধিকার আইনে ভিন্নতা ছিল। পূর্বে পুরুষরা নিরঙ্কুশভাবে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হিসেবে অংশ পেত। অন্যদিকে বোম্বে ছাড়া সব প্রদেশে হিন্দু নারীরা সম্পত্তিতে সীমিত স্বার্থের অধিকারী হতো। হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধনী) বিল, ২০০৫ (বিলটি রাজ্যসভায় পাস হয় ১৬ আগস্ট, ২০০৫ সালে) এর মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে বিশাল পরিবর্তন এসেছে এবং এতে করে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, সব হিন্দু কন্যা ও পুত্রসন্তান মাতা-পিতার সম্পত্তিতে সমানভাবে হিস্যা পাবে; যা ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারত নারীদের সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে।[79]

প্রতিবেশী দেশ ভারতে হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত যেসব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশেও আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রথমেই যে বিষয়টি করা দরকার তাহলো, উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের পূর্বে পলিসি নির্ধারণ করতে হবে এরপর যথাযথ উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করে হিন্দু নারীদের সমান অংশপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[80] যাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে এখনো ছেলেমেয়ের মাঝে এক বিরাট ব্যবধান অনুভূত হয়। এ বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্রকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সম্পত্তি ও সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে হবে। পরিবারে নারীদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। চতুর্থত, নারীদের সাংবিধানিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে যার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে উল্লিখিত অধিকারসমূহ- যা রাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের তার প্রতিফলন ঘটবে। রাষ্ট্র অধিকারের কথা বলে কখনই দায় এড়াতে পারে না। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। ১৯৭১ সালে জনগণের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল রাষ্ট্র, তা কোনোক্রমেই ভঙ্গ হওয়া উচিত নয়। চতুর্থত, নারীদের স্বামী এবং পিতার সম্পত্তির সমুচিত অংশ প্রদান করতে হবে এবং তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এতে রাষ্ট্রে

[79] হিন্দু উত্তরাধিকার *(সংশোধনী)* বিল, ২০০৫

[80] উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫

সাংবিধানিক চেতনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটবে। পঞ্চমত, স্ত্রীধনসহ হিন্দু নারীদের অর্জিত সব সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। ষষ্ঠত, হিন্দু পুরুষদেরও নারীদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পাশাপাশি নারীদেরও তাদের অধিকার সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকতে হবে।

সর্বোপরি বলা যায়, জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে নারী-অধিকার রক্ষায় ও নিশ্চিতকরণে আমাদের বদ্ধপরিকর হতে হবে। কারণ, সভ্য সংস্কৃতিতে অনিয়ম চলতে দেয়া যায় না। হিন্দু নারীদের অসম্মানিত করার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে পুরো নারী জাতিই অসম্মানিত হয়ে পড়ে। ফলে বঞ্চনা ও বৈষম্যমুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৫.৩ ভূ-সম্পত্তিতে নারীর ব্যক্তিগত ও সাংবিধানিক অবস্থান

সনাতন ধর্মের মনীষী মনু বলেছেন, নারী শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধ্যকে পুত্রের অধীন থাকবে। এই উক্তি নারীর চিরকালের বন্দিত্বের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নারীর আজকের যে বন্দিদশা তা মানুষের সামগ্রিক মনুষ্যত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই জনপদে নারী মানুষের অন্তর্গত নয়, মানুষ বলতে এখনো পুরুষকেই বোঝায়। নারী যে সমাজে মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি, সেখানে স্বাভাবিক কারণেই সম্পদে তার অবস্থান অত্যন্ত নাজুক। কাগুজে মালিকানা বাদ দিলে ভূ-সম্পদে নারীর মালিকানা ১০ শতাংশের বেশি নয়।[81]

সাধারণভাবে তিন প্রকার উৎস থেকে নারী সম্পদের মালিকানা পায়। প্রথমত ক্রয়সূত্রে, দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের তরফ থেকে খাসজমি গৃহায়ন প্রকল্প বা হালের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে, তৃতীয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে বা দানসূত্রে। আমাদের দেশে ইদানিং দুর্নীতিপরায়ণ স্বামীরা কালো টাকা বৈধ করতে গিয়ে স্ত্রীর নামে সম্পদ ক্রয় করে (যা স্ত্রীর নয়) স্ত্রীকে কাগুজে মালিক হিসেবে আবির্ভূত করেন। এটিকে বেনামী মালিকানাও বলতে পারেন। ভূ-সম্পদে ব্যক্তিগত আইনে (ধর্মীয় আইনে) নারীর অবস্থান এ রকম-

[81] এস এম আব্রাহাম লিংকন (২০১৫), ভূ-সম্পত্তিতে নারীর ব্যক্তিগত ও সাংবিধানিক অবস্থান (*http://ajkerpatrika.com/open-air/2015/06/16/38304/print)*

৫.৪ ভূ-সম্পদে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অবস্থানঃ

আমাদের দেশে ২৭টি নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর হিসাব পাওয়া যায়। এরা প্রায় মাতৃতান্ত্রিক জীবন ধারায় অভ্যস্থ। এদের মধ্যে গাড়ো ও খাসিয়া সংখ্যায় বেশি। সম্পদে এদের মালিকানা নারীদের হাতে। গাড়ো পুরুষরা ভূ-সম্পত্তির মালিক নয়। এ সমাজে গৃহকর্ত্রী বা তার বংশ কর্তৃক কন্যাদের মধ্য থেকে একজনকে উত্তরাধিকার (গাড়োরা এ পদ্ধতিকে নকনা বলে) নির্বাচন করে। সচরাচর পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যাকে নকনা মনোনীত করা হয় এবং তার বিয়ে দেয়া হয় পিতার বোনের ছেলের সাথে। এ সকল সমাজে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটছে বিশেষত খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার এখানে লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান। ফলে এখন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অবস্থান ক্রমান্বয়ে বদলে যাচ্ছে। একইসাথে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার জন্য ভূ-সম্পদে নারীর উত্তরাধিকারগত অবস্থানও বদল হচ্ছে।

৫.৪.১ একজন মুসলিম নারী কন্যা হিসেবে যা পায়-

মৃত ব্যক্তির একমাত্র সন্তান কন্যা হলে সে কন্যা মৃত পিতা বা মাতার সম্পদের মাত্র অর্ধেকের মালিক হবেন। অবশিষ্ট সম্পদ নিকট-আত্মীয়ের অনুকূলে বর্তাবে। মৃত ব্যক্তির পুত্র নেই কিন্তু দুই বা ততোধিক কন্যা আছে, সেক্ষেত্রে সকল কন্যা মিলে মৃত পিতা/মাতার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ মিলিতভাবে পাবেন। অবশিষ্ট একভাগ নিকট-আত্মীয়ের অনুকূলে যাবে। অথচ মৃতের যদি একমাত্র সন্তান পুত্র হয় সে পুত্র ষোলআনা সম্পদের মালিক হবেন। মৃতের কন্যা ও পুত্র থাকলে কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাবেন।

৫.৪.২ মুসলিম নারী স্ত্রী হিসেবে যা পায়-

মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান কিংবা নিম্নগামী বংশধর না থাকলে মৃতের স্ত্রী স্বামীর সম্পদের চার ভাগের একভাগ পাবেন। আর যদি সন্তান বা নিম্নতম বংশধর থাকে সেক্ষেত্রে স্ত্রী আট ভাগের একভাগ পাবেন।

৫.৪.৩ নারী মা হিসেবে যা পায়-

মৃত ব্যক্তির (পুত্র/কন্যা) কোন সন্তান বা পুত্রের অধ:স্তন কোন বংশধর থাকলে মা ছয় ভাগের একভাগ সম্পদ পাবেন। আর যদি সন্তানাদি বা ছেলের সন্তানাদি এবং একজনের বেশি ভাই বা বোন না থাকে সেক্ষেত্রে মা তিন ভাগের একভাগ সম্পদ পাবেন।

৫.৪.৪ বোন হিসেবে পায়-

মৃত ভায়ের কোন সন্তান, পৌত্র, পৌত্রী না থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট নারী একমাত্র বোন হলে ভায়ের সম্পদের অর্ধেক মালিক হবেন। একাধিক বোন থাকলে মিলিতভাবে তিন ভাগের দুইভাগ পাবেন।

৫.৪.৫ হিন্দু আইন মতে-

একজন নারী তার পিতা, মাতা বা স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকারী নন। ভ্রাতা না থাকলে পিতা/মাতার এবং পুত্র না থাকলে স্বামীর সম্পদে সংশ্লিষ্ট নারী জীবন-স্বত্ব লাভ করেন। বন্ধ্যা ও পুত্রসন্তানহীন কন্যা জীবন-স্বত্ব থেকেও বঞ্চিত হবেন।[82]

অবিবাহিত কন্যা পিতা-মাতার ত্যক্ত সম্পদ থেকে প্রতিপালিত ও পাত্রস্থ হতে পারবেন মাত্র। ১৯৩৭ সালের পর বিধবা নারী একপুত্রের সমান সম্পদ জীবনসূত্রে লাভ করেন।

৫.৪.৬ খ্রিস্টান আইন মতে-

উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ -এর বলে একজন খ্রিস্টান ভগ্নি পিতার সম্পদে ভ্রাতার সমান অংশ লাভ করেন। একজন বিধবা স্ত্রী সন্তান থাকলে এক-তৃতীয়াংশ আর সন্তান না থাকলে স্বামীর সম্পদের ষোলআনাই লাভ করেন। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও পিতা জীবিত না থাকলে একজন মা মৃতের ভাই-বোনের সঙ্গে সমান সম্পদ পাবেন। উপর্যুক্ত

[82] *Media and Women (Ed.) The Hindustan Times, 4 January 1983, p. 9*

ধর্মীয় বণ্টন নীতিমালা বিশ্লেষণ করলে তুলনামূলক খ্রিস্টীয় নীতিমালা অনেক নারীবান্ধব। হিন্দু আইন নিষ্ঠুর আর মুসলিম আইন সে তুলনায় প্রগতিশীল।[83]

ইসলাম সম্পদে নারীকে কিছুটা হিস্যা দিয়েছে বলেই আমরা বলে থাকি ইসলাম প্রগতিশীল ধর্ম। যখন হিন্দু ধর্মে সম্পদে নারীর কিছুই নাই, সেখানে মুসলিম সমাজে এক ভাই সমান দুই বোন-এর হিসাবটি অবশ্যই প্রগতিশীল। উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীরা ধর্মের নামে বিধিটি মানলেও মনে করেন এ বণ্টন নীতি অন্যায়। আবার মুসলিম নারীরা মনে করেন ভায়ের অর্ধেক বোন এ হিসাবটি নিখাদ অসাম্য। যেভাবেই হোক এই বণ্টন নীতিগুলো নারীর প্রতি অবহেলার প্রকাশ। আমাদের দেশে নারী রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারে অবহেলার শিকার। কর্মস্থলে নিগৃহীত, সম্পদে বঞ্চিত। নারীর এই বঞ্চনা নতুন নয়। নারী সে শাহজাদীই হোন কিংবা জসীম উদ্্দীনের আসমানীই হোন, সম্পদে তার বঞ্চনা নিরন্তর। কাগজে পাইলেও বাস্তবে নাই। নারীর সকল উৎপাদনশীলতার মালিক প্রকারান্তরে পুরুষই। কারণ মালিকানা ও পুরুষতন্ত্র আজ সমার্থক।

৫.৫ আমাদের সংবিধানে নারীর অবস্থানঃ

সংবিধান আমাদের আইনের জননী বা Mother of Law সংবিধানের মধ্য থেকেই রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালিত। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলোর অন্যতম। আমাদের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমতার কথা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী এবং ২৮ অনুচ্ছেদে বলা আছে- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। সংবিধান নারী ও পুরুষে সমতার কথা বলেছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমাদের সমাজে নারীরা কি সেই সমানাধিকার পাচ্ছেন আইনে সংবিধানের প্রাধান্য থাকার পরও সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমানাধিকার রাষ্ট্রে কার্যকর হতে পারছে না। সংবিধানের ১৩। গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত- ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা এই বিধানটি নারীর

[83] উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫

সমানাধিকারের প্রধান অন্তরায়। এখানে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা বলতে বুঝায় হিন্দু ও মুসলিম আইনে বর্ণিত সম্পদ প্রাপ্তির নিয়ম। সংবিধানে বর্ণিত ব্যক্তিগত আইন (১৩। গ অনুচ্ছেদ) প্রবল শক্তিশালী। ব্যক্তিগত আইনের সাংবিধানিক অনুমোদন থাকায় সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার আইনযোগে বলবৎযোগ্য নয়। যার ফলে আমাদের নারীরা সংবিধানে বর্ণিত Equal Rights ভোগ করেন না।[84]

সংবিধানের ১৯। (১) অনুচ্ছেদে বলা আছে- সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) বলা আছে, মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষমবণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সংবিধানের এই নির্দেশনাবলী রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও দর্শনরূপে বিবেচনা করা হলেও এর বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সরকারগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নারী উন্নয়ন নির্ভরশীল। সংবিধানের ১৩।গ ও ২৭, ২৮ অনুচ্ছেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে নারীর সমানাধিকার শুধু কাগজেই থেকে যাবে। সংবিধানের এই দ্বিমুখী অবস্থান নারীর Equal Rights ভোগে প্রধান বাধা। ভূ-সম্পদ এবং অর্থনীতিতে নারীর শক্ত অবস্থান ব্যতীত নারীমুক্তি কল্পনামাত্র। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু নারীর অবস্থান একজন মুসলিম নারীর চেয়ে বিস্তর পিছিয়ে। মুসলিম বণ্টন নীতি অনুসারে সম্পদে নারীর কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠা হলেও এটি নারীকে পুরুষের অর্ধেক মর্যাদার সামিল করে। এই নীতির বিরুদ্ধে নারীরা বহু শতাব্দি ধরে সংগ্রাম করছেন।[85]

৫.৬ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ

যুগ যুগ ধরে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দুর করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই জাতিসংঘ চেষ্টা করে যাচ্ছে। নারীর অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ করে তুলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে

[84] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[85] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য আরও কার্যকর ও দীর্ঘময়োদী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশন। ইংরজৌতে একে বলা হয়েছে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women বা সংক্ষপে CEDAW (সিডও)।[86] বলা যায় জাতিসংঘ সাধারণ পরষিদে সিডও নামের এই সনদ বা কনভনেশন গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীর জন্য সমান অধকিারের লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ , নারী জাতির মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল পরিনতিতে এই সনদ গৃহীত হয়। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে বিবাহিতা-অবিবাহিতা নির্বিশেষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সকল বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণের অবসানের জন্য সনদে আহ্বোন জানানো হয়ছে । এ ছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপারশিমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার ; শিক্ষায় সমান সুবিধা ও পাঠ্যক্রম অনুসরণে সমান সুযোগ; নিয়োগদান ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীণতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং এটি ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। ইতোমধ্যে ১৫০টির ও অধিক দেশে এই কনভেনশন অনুমোদন করে স্বাক্ষরদান করেছে । বাংলাদেশে এই দলিল

[86] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), 1979

অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর। এই কনভনেশন বা সিডও দলিলের মূল মর্মবাণী হল সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবকিাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে সেই ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি এবং সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা স্থাপন করা। এর জন্য আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের সংস্কার, আইন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন, সনদে শরীক রাষ্ট্রগুলো তার সকল ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুচ্ছেদ-১

এই কনভনেশন, নারীর প্রতি বৈষম্য" বলতে বুঝাবে পুরুষ নারী ভিত্তিতে যে কোন পার্থক্য, বঞ্চনা অথবা বিধি নিষেধ যার মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়া, তা ভোগ করা অথবা বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে নারীর দ্বারা তার ব্যবহার বা চর্চা, ক্ষতিগ্রস্থ অথবা দরকার মত প্রভাব বা উদ্দশ্যে রয়েছে।[87]

অনুচ্ছেদ-২

এই কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণে সম্মত হয়। এই লক্ষ্যে তারা যা যা করবে বলে অংগীকার করে তা হচ্ছে।

ক) পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোন উপযুক্ত আইনে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং আইনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

[87]নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

খ) নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থাসহ যথোপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকারসমূহের সুরক্ষা আইনগতভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত ও অন্যান্য সরকারী প্রতর্ষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোন বৈষ্যম্য থেকে নারীকে রক্ষা কার্যকরভাব নিশ্চিত করা;

ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোন কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে তা নিশ্চিত করা;

ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

চ) প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ছ) যে সব জাতীয় দন্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো বাতিল করা।[৪৪]

অনুচ্ছেদ – ৩

পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক অধকারসমূহ প্রয়োগ ও ভোগে নারীকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ – ৪

পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে,রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কোন অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা এই কনভেনশনে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। তবে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোন ভাবেই অসম অথবা পৃথক মান বজায় রাখার ফল হিসেবে যুক্ত হবে না; সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্য অর্জিত

[৪৪] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

হলে এসব ব্যবস্থা রহিত করা হবে।

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ মাতৃত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই কনভনেশনে বর্ণিত ব্যবস্থাসহ কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে না।

অনুচ্ছেদ – ৫

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নিচে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়ছে সেগুলোর জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

(ক) পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যেসব কুসংস্কার, প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের ধরন পরিবর্তন করা;

খ) মাতৃত্বকে একটা সামাজিক কাজ হিসেবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয়- এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান-সন্ততির লালন পালন ও উন্নয়ন এবং পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নিশ্চিত করা।[89]

অনুচ্ছেদ – ৬

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহ ব্যবসার আকারে নারীকে শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছদে – ৭

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে যে সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সে গুলো হচ্ছে-

ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

খ) সরকারী নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণ এবং সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল

[89] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

পর্যায়ে সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন;

গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ – ৮

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে এবং কোন রকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজ কর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ – ৯

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজায় রাখতে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফল স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবেনা, তাকে জাতীয়তাহীন করবেনা অথবা জাতীয়তা গ্রহণে তাকে বাধ্য করা হবে না।

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুরুষের মতই সমান অধকিার প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ – ১০

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে-

ক) কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশণা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলী;স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরী, পেশাগত ও উচ্চতর কারগরী শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা;

খ) সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভুমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য

ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচী সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোন ধারণা দূরীকরণ;

গ) বৃত্তি এবং অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরী লাভবান হওয়ার একই সুযোগ প্রদান;

ঘ) বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচীসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচী, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোন দূরত্ব স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচীসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

ঙ) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন;

চ) খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

ছ) পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ – ১১

১. পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্ব প্রকার নিয়োগদানের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে-

ক) সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার;

খ) কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান প্রয়োগসহ একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;

গ) পেশা ও চাকুরী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার; পদোন্নতি চাকুরীর নিরাপত্তা এবং চাকুরীর সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবিস হিসেবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার ;

ঘ) বিভিন্ন সুযোগ সুবধিাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার ;

ঙ) বিশেষ করে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সবেতন ছুটি ভোগের অধিকার;

চ) সন্তান জণ্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখাসহ স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশে নিরাপত্তার অধিকার।

২. বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাঁদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে-

ক) গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটির কারণে বরখাস্ত এবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;

খ) বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বেকার চাকুরী জ্যেষ্ঠতা অথবা সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধাদিসহ মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটি প্রবর্তন করা;

গ) বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিতা-মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সাথে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;

ঘ) গর্ভাবস্থায় যে ধরনের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমানিত,গর্ভকালে তাদেরকে সে ধরনের কাজ থেকে বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করা;

৩. এই ধারায় বর্ণিত বষিয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময় সময় পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।[90]

[90] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

অনুচ্ছেদ – ১২

১. পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে,পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সার্ভিসসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সার্ভিস পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. একই ধারার অনুচ্ছেদ ১ এর বিধান ছাড়াও রাষ্ট্রপক্ষসমূহ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেইসাথে গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলাকালে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গর্ভকাল, সন্তান জণ্মদানের ঠিক আগে এবং সন্তান জণ্মদানের পরে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ – ১৩

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ক) পারিবারিক কল্যাণের অধিকার;

খ) ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহণের অধিকার;

গ) বিনোদনমূলক কর্মকান্ড, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার।[91]

অনুচ্ছেদ – ১৪

১) রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পল্লী এলাকার মহিলারা যেসব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের যেসব কাজ উপার্জন হিসেবে গণ্য করা হয় না সেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভূমিকা পালন করেন সেগুলো বিবেচনা করবে এবং পল্লী এলাকার নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

[91] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

২) রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ ও তা থেকে তাদরে কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, পল্লী এলাকায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে এসব নারীর জন্য নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে-

ক) সকল পর্যায় উন্নয়ন বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবালাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

খ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবালাভসহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা লাভের সুযোগ পাওয়া;

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সরাসরি লাভবান হওয়া;

ঘ) উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল ধরনের প্রশক্ষিণ ও শিক্ষা এবং সেইসাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল সামাজিক ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের সুবিধা লাভ করা ;

ঙ) কর্মসংস্থান অথবা স্বকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের সমান সুযোগ পাওয়ার উদ্দশ্যে সাহায্য গ্রুপ ও সমবায় সংগঠিত করা;

চ) সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা;

ছ) কৃষি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা ও উপযুক্ত প্রযুক্তি লাভরে সুযোগ পাওয়া এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও সেই সাথে ভূমি পুনর্বন্টন স্কীমের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করা;

জ) বিশেষ করে গৃহায়ণ, পয়ঃনিস্কাশন, বিদ্যুত্ ও পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুবিধা ভোগ করা।[92]

পরিচ্ছেদ – ৪

অনুচ্ছেদ – ১৫

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষরে বৈধ ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই

[92] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে । বিশেষ করে রাষ্ট্রসমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশোনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইবুনালে কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের সঙ্গে সমান আচরণ করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ নারীর বৈধ ক্ষমতা সংকুচিত করার লক্ষ্যে প্রণীত আইনভিত্তিক সকল চুক্তি ও যে কোন ধরনের ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে।

৪. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সকল নাগরিকের চলাচল এবং আবাসস্থল ও বসত স্থাপন বেছে নেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীক সমান অধিকার দেবে।[93]

অনুচ্ছেদ – ১৬

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে বিশেষ করে যেসব বিষয় নশ্চিতি করবে সেগুলো হচ্ছে-

ক) বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধকিার;

খ) স্বাধীনভাবে স্বামী/স্ত্রী হিসেবে সঙ্গী বেছে নেয়ার এবং তাঁদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার

গ) বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদ কালে একই অধিকার ও দায়িত্ব;

ঘ) তাঁদের বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে, তাঁদের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে, পিতা মাতা হিসেবে একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; ঙ) তাঁদের সন্তান সংখ্যা কত হবে ও সন্তান জণ্মদানে কতটা বিরতি দিয়ে হবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভিন্ন অধিকার প্রয়োগে সক্ষমতা অর্জনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও উপায় লাভের একই অধিকার;

চ) অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশীপ ও পোষ্যসন্তান গ্রহণ অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে, যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব; সকল ক্ষেত্রে শশুিদের স্বার্থই হবে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ;

ছ) পারিবারিক নাম, পেশা অথবা বৃত্তি পছন্দের অধিকারসহ স্বামী অথবা স্ত্রী হিসেবে সমান অধিকার;

[93] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

জ) বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, তা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার।

২. শিশুদের বাগদান ও শিশু বিবাহের কোন আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না এবং বিবাহের একটি সবনম্িন বয়স নির্ধারণ ও সরকারী রেজিষ্ট্রিতে বিবাহ রেজিষ্ট্রিভূক্ত বাধ্যতামুলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[94]

পরিচ্ছেদ – ৫

অনুচ্ছেদ – ১৭

১. এই কনভেনশনের বাস্তবায়ন অর্জিত অগ্রগতি বিবেচনার জন্য, কনভনেশন কার্যকার হতে শুরু হওয়ার সময় নৈতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং কনভেনশনে বর্ণিত ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন ১৮ জন, এবং শরীক পঁয়ত্রিশতম রাষ্ট্রকৃত কনভেনশন অনুমোদিত অথবা সমর্থিত হওয়ার পর ২৩ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত একটি কমিটি গঠন করা হবে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের নাগরিকদের মধ্য থেকে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করবে, যারা ব্যক্তি যোগ্যতায় কাজ করবেন এবং তাদের নির্বাচনের সময় ন্যায্য ভৌগলিক এলাকা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও বিভিন্ন পর্যায়ের সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব এবং সেই সাথে মুল আইনগত পদ্ধতিসমূহ বিবেচনা করা হবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হবে। প্রতিটা রাষ্ট্রপক্ষ তার নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে পারবে।

৩. এই কনভনেশন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাস পর প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি নির্বাচনের তারিখের অন্ততঃ তিন মাস আগে জাতিসংঘ মহাসচিব দুই মাসের মধ্যে মনোনয়ন পেশ করার আহবান জানিয়ে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছে পত্র দেবেন। মহাসচিব, মনোনীত ব্যক্তিদের নামের অদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন যাতে এসব প্রার্থীকে মনোনয়ন দানকারী রাষ্ট্রসমূহের নাম উল্লেখ থাকবে এবং এই তালিকা তিনি রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছে পাঠাবেন।

---

[94] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

৪. মহাসচিব কর্তৃক জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আহুত রাষ্ট্রপক্ষসমূহের এক বৈঠকে কমিটির সদস্যদের নির্বাচন হবে। ঐ বৈঠকে কমিটির জন্য নির্বাচিত সদস্য হবেন তাঁরাই যারা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সর্বাধিক সংখ্যক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন। বৈঠকের কোরাম গঠনের জন্য কনভনেশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে।

৫. কমিটির সদস্যরা চার বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। অবশ্য প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নয় জনের মেয়াদ দুই বছর পর শেষ হয়ে যাবে; প্রথম নির্বাচনের পরপরই কমিটির চেয়ারম্যান লটারীর মাধ্যমে এই নয় জন সদস্যের নাম বাছাই করবেন।

৬. পঁয়ত্রশিতম অনুমোদন অথবা সমর্থনের পর এই ধারার ২, ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিটির অতিরিক্ত পাঁচজন সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে নির্বাচিত অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে দুই জনের মেয়াদ দুই বছর পর শেষ হবে কমিটির চেয়ারম্যান লটারীর মাধ্যমে এই দুই জন সদস্যের নাম বাছাই করবেন।

৭. অনিয়মিত শূন্যতা পুরণের জন্য যে রাষ্ট্রের বিশষেজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করা থেকে বিরত রয়েছেন, সেই রাষ্ট্র, কমিটির অনুমোদন সাপক্ষে, তার নাগরিকদের মধ্য থেকে অপর একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে।

৮. কমিটির দায়িত্বের গুরুত্ব বিবেচনা করে সাধারণ পরিষদের আরোপ করা শর্তে কমিটির সদস্যগণ, সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নিয়ে জাতিসংঘের তহবিল থেকে বেতন বা ভাতা গ্রহণ করবেন।

৯. জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের অধীনে কমিটির কার্যক্রম কার্যকর ভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন।[95]

অনুচ্ছেদ – ১৮

১. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, এই কনভেনশনের বিধানসমূহ কার্যকর করতে আইনগত, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক ও অন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে অর্জিত অগ্রগতির বিষয়ে একটা রিপোর্ট কমিটির বিবেচনার জন্য মহাসচিবের কাছে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং তা পেশ করা হবে;

ক) কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এক বছরের মধ্যে এবং

[95] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

খ) তারপর প্রতি চার বছর অন্তর এবং কমিটি যখনই অনুরোধ করবে, সেই সময়।

২. রিপোর্টে এই কনভেনশনের অধীন প্রত্যাশিত মাত্রায় দায়িত্ব পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়াদি ও অসুবধিাসমূহের উল্লখে থাকতে পারে।

অনুচ্ছেদ – ১৯

১. কমিটি নিজেই তার কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করবে।

২. কমিটি দুই বছর মেয়াদের জন্য তার কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।[96]

অনুচ্ছেদ – ২০

১. কমিটি, এই কনভেনশনের ১৮ ধারা অনুসারে পেশকৃত রিপোর্টসমূহ বিবেচনার জন্য সাধারণতঃ বছরে একবার অনধিক দুই সপ্তাহের জন্য বৈঠকে মিলিত হবে।

২. কমিটির বৈঠকসমূহ সাধারণতঃ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অথবা কমিটি নির্ধারিত অন্য যে কোন সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ – ২১

১. কমিটি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে প্রতি বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে তার কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে এবং রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট ও তথ্য পরীক্ষার ভিত্তিতে পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ এবং সেই সাথে রাষ্ট্রপক্ষসমূহের কোন মন্তব্য থাকলে, তা কমিটির রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. মহাসচিব নারীর অবস্থান সম্পর্কিত কমশিনের অবগতির জন্য কমিটির রিপোর্ট তার কাছে পাঠাবেন।[97]

অনুচ্ছেদ – ২২

এই কনভেনশনের যেসব বিধান বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধির আওতায় পরে, সেগুলোর বাস্তবায়ন বিবেচনার ক্ষেত্রে তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। যেসব ক্ষেত্রে কনভেনশনের বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধির আওতায় পড়ে, সেগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহকে রিপোর্ট করার জন্য কমিটি আহবান জানাতে পারবে।

---

[96] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

[97] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

পরিচ্ছেদ – ৬

অনুচ্ছেদ – ২৩

এই কনভেনশনের কোন কিছুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক উপযোগ্য এমন কোন বিধানের জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করবে না, যে বিধান অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে :

ক) শরীক একটি দেশের আইনে; অথবা

খ) ঐ দেশের জন্য কার্যকর অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি অথবা সমঝোতায়।[98]

অনুচ্ছেদ – ২৪

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, এই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

অনুচ্ছেদ – ২৫

১. এই কনভেনশন সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য খোলা থাকবে।

২. জাতিসংঘ মহাসচিব এই কনভেনশনের রক্ষকের দায়িত্ব পালন করবে।

৩. এই কনভেনশন অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদনের দলিলপত্রাদি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা রাখা হবে।

৪. এই চুক্তি সকল রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থনের জন্য খোলা থাকবে। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে সমর্থনের একটি দলিল জমা দেয়ার মাধ্যমে সমর্থন কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ – ২৬

১. যে কোন রাষ্ট্রপক্ষ যে কোন সময় জাতিসংঘ মহাসচিবকে সম্বোধন করে লিখিত নোটশিটের মাধ্যমে বর্তমান কনভেনশন সংশোধনের অনুরোধ জানাতে পারবে।

২. এ ধরনের অনুরোধের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে কি না জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ – ২৭

[98] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

১. অনুমোদন অথবা সমর্থনের ২০তম দলিল জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা দেয়ার তারিখের পর ত্রিশতম দিন থেকে এই কনভেনশন কার্যকর হওয়া শুরু হবে।

২. অনুমোদন অথবা সমর্থনের ২০তম দলিল জমা দেয়ার পর এই কনভেনশন অনুমোদন অথবা সমর্থনকারী প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে, স্বঅনুমোদন অথবা সমর্থনের নিজস্ব দলিল জমা দেয়ার তারিখের পর ত্রিশতম দিন থেকে কনভেনশনটি সংশ্লিষ্ট দেশের জন্য কার্যকর হবে।

অনুচ্ছদে – ২৮

১. জাতিসংঘ মহাসচিব অনুমোদন অথবা সমর্থনের সময় রাষ্ট্রসমূহ যেসব মতামত প্রদান করবে তা গ্রহণ করবেন এবং সকল রাষ্ট্ররে মধ্যে তা বিতরণ করবেন।

২. বর্তমান কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দশ্যেবিরোধী বক্তব্য দানের অনুমতি দেয়া হবে না।

৩. প্রদত্ত মতামত জাতিসংঘ মহাসচিবকে সম্বোধন করে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং মহাসচিব তখন সকল রাষ্ট্রকে এ বষিয়ে অবহতি করবেন। এ ধরনের নোটিশ যেদিন গ্রহণ করা হবে,সেদিন থেকে তা গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ – ২৯

১. এই কনভেনশনের ব্যাখ্যা অথবা প্রয়োগের ব্যাপারে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রপক্ষের মধ্যে কোন মত বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা না গেলে তাদের একজনের অনুরোধে বিষয়টি সালিশের জন্য পেশ করা হবে। সালিশের জন্য অনুরোধ জানানোর তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের যে কোন একটি রাষ্ট্র আদালতের বিধি অনুসারে অনুরোধের মাধ্যমে মত বিরোধের বষিয়টি ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করতে পারবে।

২. প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষ এই কনভনেশন স্বাক্ষর, অনুমোদন অথবা সমর্থন করার সময় ঘোষণা করতে পারবে যে এই ধারার ১ অনুচ্ছেদ দ্বারা আবদ্ধ বলে বিবেচনা করেনা। এই মর্মে মত প্রদানকারী কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে কনভনেশনে শরীক অপর রাষ্ট্রসমূহ ঐ অনুচ্ছদে দ্বারা হবেনা।

৩. কোন রাষ্ট্রপক্ষ এই ধারার ২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন মতামত প্রদান করলে যে কোন সময় সেই মতামত জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে নোটিশ দানের মাধ্যমে প্রত্যাহার করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ – ৩০

এই কনভেনশন, যার আরবী, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমান গ্রহণযোগ্য, জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা রাখা হবে।

এই দলিলে যা কিছু লেখা আছে, তা প্রত্যয়নপূর্বক যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছেন।[99]

সুতরাং বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইন অনুসারে নারী অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার ভূমিকা অতুলনীয়। বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা বাংলাদেশের সকল নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নাড়ির ক্ষমতায়ন ও নারীদের বৈষম্য বিলোপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছে। নারীরা আজ নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছে, শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে পুরুষের চেয়ে বেশি গতিশীল হয়ে। আজকের নারীরা নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা তো দূরে থাক, তারা নিজেদেরকে উপস্থাপন করছে বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রতিটি অঙ্গনে। এসব সফলতার পেছনে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার অবদান অতুলনীয়।

[99] নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নারী সনদ ও নারী নীতিমালা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিভিন্নভাবে প্রবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলে নারীদের সম-অধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যমে নারীদের বিভিন্ন কর্মে অংশগ্রহণ ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা সর্বদা বলীয়ান।

৬.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১ ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা

৬.১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।[100]

[100] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পূনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

৬.১.২ পটভূমি

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক। তার এ আহবানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল সাধারণত: শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী ও সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে আমাদের মায়েরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে আমাদের লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লংঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। গ্রামে নিরক্ষর নারী সমাজের মাঝেও কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার আগ্রহ

জাগে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন জেঁকে বসে ও দীর্ঘ সময় সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। অবশ্য এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সংগঠনগুলির আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলিও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে ওঠে। এতে করে দেশে নারী উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।[101]

৬.১.৩ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মত নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়।[102] ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করেন। যে সব মায়েদের পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষতঃ শহীদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকুরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল: (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে

---

[101] ড. নাজমা চৌধুরী সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯১

[102] প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এছাড়াও, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রচেষ্টায় দশজন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[103]

নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল: (১) দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; (২) নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (৩) নারীকে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; (৪) উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্যে দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; (৫) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা; এবং (৬) মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বৃত্তিপ্রথা চালু করা যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল নামে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্ত:খাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচীর কাজও শুরু হয়।

[103] বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭২

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০)[104] নারী কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০)[105] একই কর্মসূচি গৃহীত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্ত:খাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্দ্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ যথা, হোষ্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য।[106]

ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারী সহায়তা কর্মসূচী, কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল স্থাপন, দু:স্থ নারীর জন্য খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচী, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রচেষ্টাকেই আরো জোরদার করা হয় এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়।[107]

---

[104] দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা *(১৯৭৮-১৯৮০)*

[105] তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা *(১৯৮৫-৯০)*

[106] চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা *(১৯৯০-৯৫)*

[107] পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮

৬.১.৪ বিশ্ব প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশ ও নারী উন্নয়ন

আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সত্তর দশকের প্রথম ভাগ থেকেই তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার নারী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলধারায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নারী সমাজ উন্নয়নের যে অবস্থানে রয়েছে তার ভিত্তি এই উদ্যোগের ফলে রচিত হয়। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'নারী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি-। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫ পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয় ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ; স্বাস্থ্যসেবার অসম সুযোগ; নারী নির্যাতন; সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী; অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার ; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা; নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; নারীর মানবাধিকার লংঘন;

গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং কণ্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য। সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।[108]

৬.২ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়।[109] নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও (চ) সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সনদে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অন্তর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তে সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে।

[108] পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯২

[109] নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও), ১৯৭৯

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায় সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও আনতর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বিশ্ব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটের অধিবেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র হিসেবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

৬.২.১ নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"। ২৮(২) অনুচ্ছেদ আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। ২৮(৩)-এ আছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে, নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। ২৯(১) এ রয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। ২৯(২) এ আছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে

৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।[110]

৬.২.২ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচী, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচন ঋণ প্রদান কর্মসূচি। নারীদের কৃষি, সেলাই, ব্লক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দারিদ্র্যবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে এই কৌশলপত্রে রয়েছে সামজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

[110] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

বলয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দু:স্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দারিদ্র মা এই কর্মসূচীর আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি) এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০ দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশলপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষন, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাতকরনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই গুরুত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয় কৌশলপত্রে অনত্মর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ করে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৩ নারী ও আইন

বাংলাদেশে নারী ও কণ্যা শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রভৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া,

আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সেশন জজ এর অধীনে নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে।

৬.৩.১ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।[111]

৬.৩.২ নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত) ২০০৯

২০০৯ সালে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে মা কর্তৃক সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়।[112]

৬.৩.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন ২০০৯

মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের তফসিলে দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পন করা হয়।[113]

৬.৪ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন রয়েছে। এখনও নারী নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, নারী ও কণ্যা শিশু অপহরণ ও পাচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন, যৌন হয়রানী ও অন্যান্য নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। গ্রাম্য সালিশির মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদানের

[111] পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

[112] নাগরিকত্ব আইন ২০০৯

[113] ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন ২০০৯

ঘটনা ঘটছে। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো তদন্তের জন্য যথেষ্ট ফরেনসিক সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত ন্যাশনাল ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং পাঁচটি বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরীতে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা। অনেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের হয়না এবং বিভিন্ন কারণে বিচার বিলম্বিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্যাতনের শিকার নারী ও কণ্যা শিশুর সহায়তার জন্য বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়। ছয়টি বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে একই জায়গা থেকে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সেবা, পুলিশি সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দান করে আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও হেল্প লাইনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।[114] যথাক্রমে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এবং ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিসমূহে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। নারী ও কণ্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারা দেশে ৪৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হয়েছে।

৬.৫ নারী মানবসম্পদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মানব সম্পদের কোন বিকল্প নেই। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর পূর্বশর্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ। সরকার নারীকে

[114] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা

দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের প্রচেষ্টায় শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মসূচি ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। স্নাতক পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নারী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে সমসুযোগ প্রদানে সরকার সচেষ্ট। নারী শিক্ষার সমপ্রসারণে সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের কারণে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে নারীর অবস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ঘটেছে। নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার সচেষ্ট। নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দশটি নারী বান্ধব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে।[115]

৬.৬ রাজনীতি ও প্রশাসন

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রহণ করে। সরকারি চাকুরিতে মেয়েদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অবারিত করে দশভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সনে দু'জন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সনে একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়।[116]

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিতেও সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ

[115] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

[116] Usha, Rao, N. J. Political participation and awareness among rural women of chikmaglur: a study of Belthangadi and Chikmaglur Taluks. (Monthly Public Opinion Survey, Vol. 25, No. 1)

ইতিবাচক। দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সংসদের উপনেতা নারী। মন্ত্রিসভায় ৬ জন এবং জাতীয় সংসদে ৩৪৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সরাসরি নির্বাচিত ও ৪৫ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী রয়েছেন। জাতীয় সংসদ ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি আজ দৃশ্যমান। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারে ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন নির্বাচিত নারী সদস্য হওয়ার বিধান প্রণয়ন করেন। শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রশাসনে সচিব ও জেলা প্রশাসক পদে, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে নারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়।[117]

বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পর্যায়ে তিন জন এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে চার জন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। রাষ্ট্রদূত পদে তিন জন নারী বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত রয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সর্বপ্রথম নারী বিচারপতি নিয়োগ প্রদান নারী ক্ষমতায়নের নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে। এছাড়াও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে পাঁচ জন নারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশনে নারী সদস্য রয়েছেন। ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড বা তদসমপদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নারী সংগঠিত পুলিশ ইউনিট (ফিমেল ফর্মড পুলিশ ইউনিট, এফপিইউ) প্রথমবারের মত হাইতিতে দায়িত্ব পালন করছে।

৬.৭ দারিদ্র্য

দেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। গৃহস্থালি কর্মে

[117] ড. নাজমা চৌধুরী সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯১

নারীর শ্রম ও কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নারীর সঠিক মূল্যায়ণ নিরূপিত হয়নি। হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৬.৮ নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নামকরণ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সকল জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।[118]

জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বিত করার লক্ষ্যে ৪৪ টি নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্ত:মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক

[118] বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরকার সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

৬.৮.৯ সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা

সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬.৯ সম্পদ ও অর্থায়ন

নারী উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী হতে সহায়তার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারসমূহ ও আন-র্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাসমূহকে দেশে দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমানহারে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক সারা বিশ্বে নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে ইউএন উইমেন (**UN Woman)** নামক একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে অবহিত এবং আন্তর্জাতিক পরিসর ও ইউএন উইমেন (**UN Woman)** থেকে নারী উন্নয়নে সহযোগিতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

৬.১০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করা। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানে স্বীকৃত নারীর মৌলিক অধিকার, আন্তর্জাতিক সনদসমূহ যথা, সিডও, সিআরসি এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি

প্রণয়ন করেছে। মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারী ও শিশু বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ, নারী ও শিশুদের আইনগত ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়, কাজের সুযোগ সৃষ্টিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক পরিষদের কার্যক্রম, উইড ফোকাল পয়েন্ট কার্যক্রম সমন্বয়, নারী সংগঠন ও সুশীল সমাজের কাজের সমন্বয়, স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন, বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন, রোকেয়া পদক প্রদান, শিশুর উন্নয়ন বিষয়ে ইউনিসেফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।[119]

৬.১১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।

[119] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-১৪, বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।
- নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
- বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- গণ মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা সহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।
- নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
- নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
- মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।
- বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা
- বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া
- গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে,সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
- মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।[120]

৬.১১.১ কন্যা শিশুর উন্নয়ন

- বাল্য বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।
- কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
- কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।

[120] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

- কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।
- কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাসত্মাঘাটে কন্যা শিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৬.১১.২ নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ

- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা,
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।
- নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।
- নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন করা।
- নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা।
- নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সমপ্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।[121]

৬.১১.৩ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান

- সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।[122]

৬.১১.৪ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা।

[121] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

[122] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

- নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত: কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।
- কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।
- মেয়েদের জন্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা।
- অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচীতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা।
- সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া
- শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।
- নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।
- নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।

- জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
- নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১১.৬ নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ

- হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন-র্ভূক্ত করা, বিধবা ও দুঃস' মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা।
- দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।[123]
- দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।
- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
- জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

৬.১১.৭ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা;

[123] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।
- পার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

৬.১১.৮ নারীর কর্মসংস্থান

- নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- চাকরি ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাসত্মবায়ন নিশ্চিত করা।
- সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরি ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।
- নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন
- নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস-বায়ন করা এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া অনুসরণ অব্যাহত রাখা। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা

- জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্তান ও ভূমিকা সম্বলিত জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কাজের জন্যে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।[124]

৬.১১.৯ নারী ও প্রযুক্তি

- নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।

৬.১১.১০ নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

- দুস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।[125]

৬.১১.১১ নারী ও কৃষি

- কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।

[124] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

[125] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

- জলবাইয়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।
- কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সম মজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষি শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬.১১.১২ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

- রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।[126]

৬.১১.১৩ নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

- প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের ব্যবস্থা করা।
- প্রশাসনিক, নীতি নির্ধারনী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা।
- জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আনত্মর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/ মনোনয়ন দেয়া।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশপর্যায় সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।
- সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা
- কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধানত্ম গ্রহণের সকল সত্মরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।[127]

৬.১১.১৪ নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

- নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।
- নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।

[126] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

[127] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

- মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা।
- এইডস রোগসহ সকল ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত: গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাসত্মবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন সাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।
- বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়: নিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।
- উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- পরিবার পরিকল্পনা ও সনত্মান গ্রহণের সিদ্ধানেত্মর ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
- নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।[128]

৬.১১.১৫ গৃহায়ন ও আশ্রয়

- পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অনত্মর্ভুক্ত করা।
- একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীনারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষনার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

[128] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

- নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন, হোস্টেল, ডরমিটরী, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দু:স্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা করা।

৬.১১.১৬ নারী ও পরিবেশ

- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচীতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।
- দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা
- দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।
- দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।
- দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।

- দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।
- গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।
- দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সমপ্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সমপ্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্থ নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।[129]

৬.১১.১৭ অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬.১১.১৮ প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

- জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারীর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধী নারীদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।
- যে সমস্ত নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেইসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা।

[129] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

- প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী নারীদের লালন পালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা
- প্রতিবন্ধিতার কারনে কোন নারী যেন জাতীয় নারী নীতির আওতায় কোন প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা।[130]

৬.১১.১৯ নারী ও গণমাধ্যম

- গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।[131]

৬.১১.২০ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকান্ডে নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

[130] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

[131] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

৬.১১.২০.১ জাতীয় পর্যায়

ক) নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সম্পদ নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

খ) জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ : নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পরিষদে কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

(১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

(২) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নূতন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

(৩) নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

(৪) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।

(৫) মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন।

(৬) সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৭) পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

গ) সংসদীয় কমিটি: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ) নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট: বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যূনতম পক্ষে যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা হবে। নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ও মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া,ফোকালপয়েন্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় ও তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।[132]

ঙ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারী-বেসরকারী নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি "নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি" গঠন

[132] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

করা হবে। এই কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস-বায়নের জন্যে পরামর্শ প্রদান করবে।

৬.১১.২০.২ জেলা ও উপজেলা পর্যায়

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নারী উন্নয়নকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে।[133]

৬.১১.২০.৩ তৃণমূল পর্যায়

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে। উপরন্ত, তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির জন্যে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.১১.২১ নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। এই কাজে সরকারি-বেসকারী উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসরকারি ও সামাজিক সংগঠন সমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে:

[133] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

ক. গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান করা হবে। সরকারি সকল কর্মকান্ডে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস-বায়ন করা হবে।[134]

খ. জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আইনগত সহায়তাদান এবং এ জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নরত নারী সংগঠন সমূহকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। উল্লেখিত ধরণের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী সংগঠন সমূহের সাথে সহায়তা ও সমন্বয় করা হবে।

৬.১১.২২ নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

[134] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

৬.১১.২৩ নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরী, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।[135]

৬.১১.২৪ কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংগঠনসমূহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।
- সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
- সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে।
- মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে যাতে নারী প্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে পিএটিসি, প্লানিং একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে ও কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ (২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নীতি নির্ধারক, আইন

[135] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

- সমাজের সকল স্তরে বিশেষভাবে প্রণীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়কে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন, বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারি-বেসকারী সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। নারীর বিষয়ে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে সমন্বিত করা হবে।
- নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। সে সব কর্মসূচীতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাসি-মূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।[136]

৬.১১.২৫ আর্থিক ব্যবস্থা

- তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (জিআরবি) অনুসরণ

[136] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

- উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।
- পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প, গৃহায়ন, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপ-খাতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.১১.২৬ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যনত্ম সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৬.১১.২৭ নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.১২ সিডও সনদ বাংলাদেশের নারী ও বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা

বিশ্বের সব দেশে নারীরা অধিকার আদায়ের আন্দোলন করছেন। সিডও সনদসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতিমালাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা হচ্ছে। এভাবেই ক্রমাগত নারী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। জাপান আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন আর আমাদের জাতীয় নারী আন্দোলন অভিন্ন; বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এসব আন্দোলনের মূলকথা নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এখানে যেমন প্রয়োজন পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা তেমনি রয়েছে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব।[137]

৩ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সিডও দিবস। সিডও হল জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সিডও সনদ গ্রহণ করে। এর পাঁচ বছর পর ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার সিডও অনুমোদন করে। তবে সিডওর প্রাণ হিসেবে চিহ্নিত দুটি ধারার ওপর থেকে সংরক্ষণ তুলে না নেওয়া হয়নি এখনও। ফলে কাগজে-কলমে নারীর অধিকারের কথা স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। শিক্ষায় কর্ উদ্দীপনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের আসার চেষ্টা দৃশ্যমান হলেও তাঁরা কর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে অহরহ নির্যাতিত হচ্ছেন। বিশ্বের অনুন্নত অংশে শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায়, সর্বোপরি ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক নিস্পেষণের জাঁতাকলে পড়ে নারী যেমন তাঁর প্রাপ্য অধিকার পাচ্ছেন না, তেমনি নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছেন নানাভাবে। নারীর প্রতি সহিংসতা নানাভাবে নানা কৌশলে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, ৮৭ ভাগ নারী নিজগৃহে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। নারীর প্রতি সহিংসতা

[137] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫, বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা

বন্ধের জন্য কত কথা বারবার বলছি– সভা, সেমিনার, গোলটেবিলের আলোচনা শুনতে শুনতে ত্যক্তবিরক্ত হচ্ছি। এটা যেমন সত্য; কিন্তু না বলেই বা উপায় কী?

একই ঘটনা যদি বারবার ঘটতে থাকে বা এর মাত্রা ও নিমর্মতা যদি সমাজকে ক্রমাগত বিদীর্ণ করতে থাকে, নারীর অস্তিত্ব যদি হুমকির মুখে পড়ে বিপন্ন হয়ে ওঠে, তবে না বলে কি পারা যায়? যদিও জানি, দীর্ঘদিন ধরে বারবার বলেও এর তেমন টেকসই কোনো প্রতিকার হচ্ছে না। কিন্তু লক্ষ্য পূরণের আগে লড়াই থামালে তো চলবে না; লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, ৮৭ ভাগ নারী নিজগৃহে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন।

অতীতে নারী নির্যাতনের সূত্রপাত হয়েছিল আইনের বাস্তবায়ন ও নীতিমালার সঠিক প্রফলন না ঘটায়; এখনও যা অব্যাহত রয়েছে। নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি এবং নিত্যনতুন ধরনের কথা বিবেচনায় আনলে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতকরা শিখে নিয়েছে নিপীড়ন ও নির্মমতার নানা কৌশল। এসিড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সবই প্রয়োগ করা হচ্ছে নারীর উপর। কিন্তু আমরা এ-ও জানি, নারীরা সব বাধাকে তুচ্ছ করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সামিল হচ্ছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে নারীরা অগ্রগতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁরা ভূমিকা রাখছেন। ভূমিকা রাখছেন কৃষিতে, কলকারখানায় ও পোষাক শিল্পে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সাংবাদিকতা, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ এবং সবশেষ পর্বতারোহণের মতো চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগেও সফল হচ্ছেন তাঁরা।

কিন্তু এরপরও বড় সত্য হচ্ছে, সব ক্ষেত্রে নারীরা এখনও সমানভাবে এগিয়ে আসতে পারছেন না। নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেনি সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবারসহ সব অঙ্গনে। নারীর অগ্রগতির পথ অবাধ ও উন্মুক্ত করতে তাঁদের ক্ষমতায়নের কোনো বিকল্প নেই। বছরে কয়েক আগে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ শীর্ষক দুদিনব্যাপী সেমিনারে দক্ষিণ এশিয়ার নারী নেত্রীরা নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা সহিংসতা বন্ধে নীরবতা ভেঙে নারীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

যদিও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বাংলাদেশ সরকার নানা ধরনের আইন প্রণয়নসহ আন্তর্জাতিক নীতিমালায় স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আইন প্রণয়ন করেও তার সঠিক প্রয়োগের অভাবে এই সহিংসতা বন্ধ করা যাচ্ছে না। কমনওয়েলথ সচিবালয় আয়োজিত এক সম্মেলনে নারী উদ্যোক্তারা ৭০০ মিলিয়ন ডলার অর্থের জন্য তহবিল গঠন করেছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিজনেস অ্যান্ড প্রফেসনাল উইমেন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ফ্রেডা মিরিকলিস তখন বলেন, নারীদের পেছনে বিনিয়োগ বাড়ালে তা শুধু পরিবার নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে শুধু নারী বলে বাধাগ্রস্ত হতে হয়। বিনিয়োগের স্বল্পতা ও জ্ঞানের অভাব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের নিরুৎসাহিত করছে।

কমনওয়েলথ নারীদের সম্মেলনে প্রতিনিধিরা নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে যুক্ত হওয়ার রূপরেখা প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেন, এতে দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা শক্ত-মজবুত হবে।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের নারীরা অনেকেই বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছেন। নারীরা বুঝতে পেরেছেন, পুরুষের সমকক্ষ হওয়া মানে নারীত্ব বিসর্জন দেওয়া নয়।

নারীর কল্যাণময়ী মূর্তির সঙ্গে আধুনিক ভাবমূর্তির কোনো বিরোধ নেই। সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র– সব ক্ষেত্রে সমানভাবে ক্ষমতায়িত হলে নারীর প্রতি সহিংসতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ইদানীং নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা ও বর্বরোচিত কৌশল আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। এর কারণ মূলত নির্যাতনকারী পুরুষের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, ধর্মীয় বিভ্রান্তি, অপরাধ করে শাস্তি না পাওয়ার দৃষ্টান্তের আধিক্য, রাষ্ট্রের কার্যত উদাসীনতা এবং পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অসমতা ও অসহায়তা।

অধিকার সচেতন, শিক্ষিত ও সুনাগরিক হয়ে ওঠার প্রাথমিক শিক্ষা নারী পেয়ে থাকে তাঁর পরিবার থেকেই। নারীর ক্ষমতায়ন ঘটলে এই অসমতা দূর হবে। যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারী রুখে দাঁড়াতে পারবেন। যদিও আমাদের

সমাজের নারীরা ক্রমশ পুরুষের আধিপত্য ভাঙছেন, তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রগতিশীলতা স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার তাৎপর্য অনুভব করতে পারছেন আমাদের নারী সমাজের সীমিত একটা অংশ। তাই বিস্তৃত অঙ্গনে প্রত্যেক নারীকে তাঁর নিজের উপর আস্থা রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে হবে; ভাবতে হবে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে। প্রচলিত মানদণ্ডে নিজেকে না মেপে, গতানুগতিক স্রোতে গা না ভাসিয়ে শক্তি অর্জন করতে হবে তাঁকে স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে।

নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই অব্যাহত শোষণ, নির্যাতন, বৈষম্য থেকে নারী সমাজের মুক্তি অর্জনে সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ ও সুশীল সমাজকে সমন্বিত প্রয়াসে উদ্যোগী হতে হবে। পরিবারকেও নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গড়তে হবে। অধিকার সচেতন, শিক্ষিত ও সুনাগরিক হয়ে ওঠার প্রাথমিক শিক্ষা নারী পেয়ে থাকে তাঁর পরিবার থেকেই।

পাশবিকতা, নিষ্ঠুরতা ও ধর্মীয় অন্ধকারের ব্যাপক প্রসারের ফলে আজ আমাদের মানবতা, গণতন্ত্র বিপন্ন-লাঞ্ছিত হচ্ছে। তাই নারী-পুরুষ নির্শেষে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সবাইকে একতাবদ্ধ হয়ে এই অপশক্তি রোধ করতে হবে। সেই লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে একমাত্র ক্ষমতায়িত নারী আর তাঁদের সাহস-প্রেরণা যোগাবে বৈশ্বিক নীতিমালা, পরিবার, মুক্তবুদ্ধির সমাজ এবং গণতন্ত্রের অর্থবহ চর্চা। এর পাশাপাশি এই মুহূর্তে যা জরুরি তা হল, বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠায় পারিবারিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্বের যথাযথ শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের নিরবিচ্ছিন্ন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। এর ফলে আজকের ক্ষমতায়িত নারীই উপহার দিতে পারবে আগামীর জন্য সৃজনশীল নতুন প্রজন্ম। স্বাধীনতার এত বছর পরও নারীর জীবনমানের উন্নতি হয়নি। উন্নয়ন ঘটেনি নারীর প্রতি সামাজিক মূল্যবোধের। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন ঘটেনি; প্রচলিত আইনের সংস্কার যথোপযুক্তভাবে হয়নি। বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনগুলোতে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান তৈরি করেছে। কাজেই সাংবিধানিক অধিকার ও আইনি সুবিধা আজ নারীর জন্য খুব প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং সে অনুসারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নারী উন্নয়ন নীতিমালা সম্পূর্নভাবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার মাধ্যমেই। তাছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর নারীদের বিভিন্নভাবে সম্মাননা ও উৎসাহ দিয়ে নারীদের আরও আত্ন-নির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের নারী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণ মানবিক দৃষ্টীভঙ্গিতে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নারীকে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করা; নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সমতাপূর্ণ ও বৈষম্যমুক্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠা করা। আর তা সম্ভব হলে গোটা সমাজ সম-অধিকার ও সমমর্যাদাভিত্তিক হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা, নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও সিডও সনদ এমন একটি অভিনব প্ল্যাটফর্ম যেখানে নারীরা নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই করতে সাহস পায়, সামনে এগিয়ে যায় দিগবিজয়ীর মত।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে জাতীয় মহিলা সংস্থার অবদান মূল্যায়ন

বাংলাদশে নারীমুক্তি আন্দোলনে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনে নারীরা ভূয়সী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সাতচল্লিশ, বায়ান্ন, উনসত্তর, একাত্তরসহ বিভিন্ন আন্দোলনে নারীরা ছিল অগ্রগামী। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা নারীদের এসব আন্দোলনে পাশে থেকে বিভিন্ন প্রতিবাদ, প্রতিবাদ মিছিল, প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সময়েও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৭.১ নারী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ

নারীর অধিকার নিয়ে প্রথম কণ্ঠস্বর দেখা যায় ১৬৪৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। ওই সময় মার্গারেট ব্রেন্ট নামক এক নারী ম্যারিল্যান্ডের অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশের দাবি করেন। কিন্তু, পুরুষতন্ত্র তা সাথে সাথে নাকচ করে দেয়। ১৬৬২ সালে ওলন্দাজ নারী মার্গারেট লুকাস রচিত 'নারী ভাষণ' বিশ্বের জ্ঞাত ইতিহাসে প্রথম নারীবাদী সাহিত্য। এই সৃষ্টিকর্মে নারীর পরাধীনতা ও অসম অধিকারের বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। ইতিহাসে প্রথম নারীবাদী হিসেবে পলেইন ডি লা ব্যারে'কে দেখা যায়। ডি লা ব্যারে ১৬৪৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬৭৩ সালে নারী প্রসঙ্গে 'equality of the two sexes, speech physical and moral where it is seen the importance to demolish itself prejudge' প্রবন্ধটি লিখেন।[138] তাছাড়া পরবর্তীতে তিনি নারী অধিকার প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে কাজ করেন। ওই সময় তিনি বলেন, পুরুষ কর্তৃক নারী সম্পর্কে যা কিছু লেখা আছে, তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে হবে। কারণ, এক্ষেত্রে পুরুষ একই সঙ্গে অভিযুক্ত এবং বিচারকের আসনে আসীন। ১৭৮৯

[138] অগাস্ট বেবেল। নারীঃ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। কলকাতা, ১৯৮৩।

সালে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আহ্বান বিশ্বব্যাপী নারী কর্মীদের কাছে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে। কিন্তু, ফরাসি বিপ্লবের পরও নারীর প্রত্যাশিত মুক্তি আসেনি। ১৭৯১ সালে ফরাসি নাট্যকার ও বিপ্লবী ওলিম্পে দ্যা গগস (Olympw de Gouges) 'নারী অধিকার এবং মহিলা নাগরিকদের ঘোষণা' প্রকাশ করেন। এতে তিনি বলেন, 'নারী জেগে উঠো; গোটা বিশ্বে যুক্তির সঙ্কেত ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। তোমার অধিকারকে আবিষ্কার করো। প্রকৃতির শক্তিশালী সাম্রাজ্য এবং পক্ষপাত, গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও মিথ্যা দিয়ে অবরুদ্ধ নয়। সত্যের শিখা পাপ ও অন্যায় দখলের মেঘকে দূর করে দিয়েছে।' ১৭৯৩ সালে এ নারীকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। সাথে সাথে নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। মৃত্যু পূর্বে অসীম সাহসিকতা নিয়ে তিনি বলেন, 'নারীর যদি ফাঁসি কাষ্ঠে যাবার অধিকার থাকে, তবে পার্লামেন্টে যাবার অধিকার থাকবে না কেন?'[139]

নারীবাদকে প্রথম সংগঠিত করেন ইংল্যান্ডের মেরি ওলস্ট্যানক্রাফট। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, দার্শনিক এবং নারীবাদী। ১৭৯২ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Vindication of the Rights of Woman' বা 'নারী অধিকারের ন্যায্যতা' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি নারীদের উপর পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নের ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরেন। বইয়ের মূল বক্তব্য হচ্ছে, নারী কোন ভোগের সামগ্রী বা যৌন জীব নয়। তারা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তাই তাদের স্বাধিকার দিতে হবে। ১৮৪০ সালে আমেরিকায় দাসপ্রথা ও মদপান বিলোপ আন্দোলনের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী চেতনা বিকশিত হয়। এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন, লুক্রেশিয়া মটো, সুশান বি অ্যান্টনি, লুসি স্টোন, অ্যাঞ্জেলিনা এম গ্রিমকে, সারা এম গ্রিমকে প্রমুখ নারীবাদী ওই সময় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে অ্যাঞ্জেলিনা এম গ্রিমকে এবং সারা এম গ্রিম'কের ভূমিকা ছিল বহুল আলোচিত। তারা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম যুগের নারীবাদী সংগঠক। নিগ্রো এই দুই বোন দাসপ্রথা বিলোপ এবং নারী অধিকারের জন্য যুগপৎ আন্দোলন করেন। এর পূর্বে ১৮৩৭ সালে আমেরিকায় প্রথম দাসপ্রথা বিরোধী নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি রাজ্যের ৮১ জন ডেলিগেট সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের অর্জনও কম ছিল না। এর মাধ্যমে মার্কিন নারীরা

[139] সুফিয়া কামাল, একালে আমাদের কাল, জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৮। সুফিয়া কামাল, মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয়, সময় প্রকাশন, বইমেলা, ২০০১।

প্রথমবারের মত রাজনীতির সুযোগ পায়। ১৮৬৮ সালে এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন ও সুশান বি অ্যান্টোনি মিলে নারীবাদী সাময়িকী 'দি রেভ্যুউলিশন প্রকাশ করেন। এখানে নর-নারীর অভিন্ন অধিকারের ব্যাপারে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ১৮৯১ সালে কেডি স্ট্যান্টন এবং আরো ২৩ জন নারী মিলিতভাবে 'নারীর বাইবেল রচনা করেন। ১৮৪৮ সালের ১৯-২০ জুলাই নারীবাদীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস-এ বিশ্বের প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমেরিকার ঘোষণার অনুরূপ 'ডিকারেশন অব সেন্টিমেন্ট' ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে আমেরিকার সংগ্রামী নারীদের লড়াই-সংগ্রাম নারীবাদী চেতনাকে আরো ত্বরান্বিত করে।[140]

৭.২ অন্যান্য দেশে সমসাময়িক আন্দোলন

১৮৭১ সালে ফ্রান্সের শ্রমজীবী জনগণ প্রথম সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠা করেন। এ আন্দোলনে হাজার হাজার শ্রমজীবী নারীর অংশগ্রহণ নারীবাদকে নতুন গতি দেয়। প্যারি কমিউন রক্ষার্থে ১০ হাজার নারী যুদ্ধে অংশ নেয়। পরবর্তীতে, প্যারি কমিউন পতনের পর যুদ্ধ পরিষদ ১০৫১ জন নারীকে অভিযুক্ত করে। এদের মধ্যে লুই মিচেল এবং এলিজাবেথ ডিট্রিভের নাম ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। উল্লেখ্য, একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেশে দেশে উদার, গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন মহৎ পুরুষরাও যুক্ত হন। ১৮৬৬ সালে দার্শনিক ও আইনজ্ঞ জন স্টুয়ার্ট মিল নারী অধিকারে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেন। স্টুয়ার্ট মিল ব্রিটেন পার্লামেন্টের সদস্য হবার পর নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন। ১৮৬৯ সালে ভোটাধিকারসহ অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি 'নারীর অধীনতা' রচনা করেন।

৭.৩ ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন

ভারতবর্ষে নারীর দুরবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হন একজন পুরুষ। নারীবাদী এই কিংবদন্তি পুরুষের নাম রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৮ সালে তিনি কলকাতায় সহমরণ এবং সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য জনমত তৈরি করেন। ফলাফল হিসেবে, ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই প্রথা বিলোপে আইন পাস করেন। এছাড়া নারী

[140] বেগম, মালেকা। বাংলার নারী আন্দোলন। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১।

শিক্ষায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেবসহ আরো বেশ কিছু ব্যক্তির মনোভাব ছিল ইতিবাচক। ১৮২২ সালে রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে গৌরমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক শিরোনামে একটি বই লিখেন।

নারীকে ধর্ম শাস্ত্রের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন আরেক মহান পুরুষ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ১৮৫০-৫৫ সালে বিধবা বিবাহের সপক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়, ওই সময় বিধবা বিবাহ প্রথার সূচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায়, ১৮৫৬ সালে ভারতবর্ষে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়। সামাজিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ১৮৬৭ সাল নাগাদ ৬০টি বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন। বাংলায় নারী শিক্ষার প্রথম অধ্যায় শুরু হয় ১৮১৮ সালে। রবার্ট মে নামক লন্ডন মিশনারী সোসাইটির জনৈক সদস্য ১৮১৮ সালে কলকাতার কাছে চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরপর চার্চ মিশনারী সোসাইটি মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসে। চার্চ মিশনারীর সহায়তায় মিস মেরী অ্যান কুক ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশেপাশে প্রায় ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারী শিক্ষায় বাঙালি নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে কলকাতা ভিক্টোরিয়া গার্লস হাই স্কুল। ১৮৪৯-এর মে মাসে এ স্কুল স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা জে.ই.ডি বেথুনের নামানুসারে প্রতিষ্ঠানটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। অক্সফোর্ডের মেধাবী ছাত্র বেথুন ১৮৪৮-এ ভারতে আসেন। তার সমস্ত সম্পদ স্কুলটির পেছনে ব্যয় করেন।[141]

ইতিহাসে দেখা যায়, ১৮৬৩ সালে কেশব চন্দ্র সেন কয়েকজন শিষ্যসহ উমেশচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে 'বামাবোধিনী সভা' স্থাপন করেন। ওই বছরই তারা বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙালি নারী আন্দোলনে এ পত্রিকাটি অসামান্য ভূমিকা রাখে। ১৮৬৯ সালে কেশব চন্দ্র সেন ঢাকায় আসেন। তার সহযোগিতায় ১৮৭১ সালে 'ঢাকা শুভসাধনী' নামে আরেকটি সমাজ সংস্কারক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সভার উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে ঢাকায় প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৮৭৬ সালে মেরি কার্পেন্টার ঢাকায় এসে স্কুলটি পরিদর্শন

[141] বেগম, মালেকা। বাংলার নারী আন্দোলন। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১।

করেন। স্কুলের ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি বেশ চমৎকৃত হন। প্রতিষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি সরকারের কাছে একটি চিঠিও লিখেন। সেই প্রশংসা পত্রের সুবাদে সরকার ১৮৭৮ সালের জুন মাসে এটিকে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এ্যাশলি ইডেনের নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ হয় ইডেন গার্লস হাই স্কুল। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলটি সরকারি করা হয়। এই স্কুলটিই আজকের ইডেন কলেজ।[142]

বাংলায় প্রথম নারীবাদী সংগঠন 'সখি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৮৮৫ সালে তিনি লাঠি এবং অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারের চেষ্টা করেন। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে ৬ জন নারীকে যোগ দিতে দেখা যায়। সরোজিনী নাইডু ও সরলা দেবী চৌধুরানী প্রমুখ নারী নেত্রী কংগ্রেসের বিভিন্ন ইউনিটে সভাপ্রধানের পদেও উন্নীত হন। ১৮৮৯ সালে ভারতবর্ষে নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত রমাবাঈ প্রকাশ্যে আন্দোলনে নামেন। ওই সময় পুনায় তিনি নারী মুক্তির বিষয়ে ভাষণ দেন। অন্যদিকে, বাংলায় প্রথম নারীবাদী হিসেবে খ্যাতি পান সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি ১৯১০ সালে সর্বভারতীয় নারী সংগঠন 'স্ত্রী মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলায় যে অনন্য সাধারণ নারীবাদী প্রবক্তার উত্থান হয়, তার নাম বেগম রোকেয়া। তিনি লিখেছেন, 'আপনারা কি কোনদিন আমাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না। আমরা দাসী কেন? কারণ আছে।' রোকেয়ার সমগ্র জীবন ও কর্ম নারী অধিকারের জন্য উৎসর্গকৃত ছিল। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, সরলা দেবী এবং পণ্ডিত রমা বাঈ হলেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের জননী।[143]

[142] Barbara, j. Nelson and Najma Chowdhury. Women and politics worldwide, Yale University, London, 1994

[143] ঠাকুর, আব্দুল হান্নান। নির্বাচন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

এ ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, তেভাগা, নানকা, টংক বিদ্রোহসহ আরো বিভিন্ন সংগ্রামে ভারতবর্ষের নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি দেখা যায়। জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, মাতঙ্গিনী হাজরা, উর্মিলা দেবী, আশালতা সেন, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, প্রভাবতী বসু, লীলা নাগ, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, দৌলতন নেছা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, হোসনে আরা খাতুন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, শান্তি ঘোষ, রীনা দাস, ইলা মিত্র, হেনা দাস, সন্তোষ কুমারী দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[144]

৭.৪ বিশ্বকে পরিবর্তন করে দেয়া ১০ নারী আন্দোলন

বিশ্ব নেতৃত্বে নারীর সংখ্যা উৎসাহব্যঞ্জকই বলা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা সমাসীন। পার্লামেন্টেও নারীর সংখ্যা কাক্সিক্ষত পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান। রাজনীতিতে নারী-পুরুষের ব্যবধান ক্রমশ কমে যাচ্ছে। অথচ আজ থেকে শত বছর আগে এ কল্পনাও করা সম্ভব ছিল না। থাকবেই বা কীভাবে। তখন নারীদের কোন ভোটাধিকারই ছিল না, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তো বহুদূরের কথা, নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছিল। অনেক নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করেও চালিয়ে গিয়েছিল ভোটাধিকারের আন্দোলন। একটা সময় তাদের তীব্র এবং গতিময় আন্দোলনের চাপে দেশে দেশে তাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হতে থাকে। ভোটাধিকার ছাড়াও নারীরা সমাজে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হয়ে আসছিল। তাই ভোটাধিকার অর্জনের পর নারীরা সমাজে নিজেদের অন্য অধিকার আদায়ের লড়াই চালিয়ে যায়। যার ফল আমরা দেখি, সমাজে আজ নারী এগিয়ে গেছে বহুদূর। এসব সাফল্যর শেকড় ওই ভোটাধিকার আন্দোলন। ব্রিটেনে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে সাফরাজেট হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে সাফরাজেটমের একটি সিনেমা। সম্প্রতি এই সিনেমার প্রিমিয়ারেও নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে গেছে।[145]

---

[144] Barbara, j. Nelson and Najma Chowdhury. Women and politics worldwide, Yale University, London, 1994

[145] Southard, Barbara, The Women's Movement and Colonial Politics, The University Press Limited, 1996; Ferdous Azim, Women's Movement in Bangladesh;

৭.৪.১ ব্ল্যাক ফ্রাইডে, ১৮ নভেম্বর, ১৯১০

ব্রিটেনের পার্লামেন্টে নারীর ভোটাধিকার বিল 'কনসিলিয়েশন বিলটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হার্বাট হেনরী এ্যাসকুয়িথ ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে প্রায় তিন শতাধিক নারী হাউস অব কমন্স ঘেরাও করে। তখন পুলিশ এই নারীদের ওপর কেবল লাঠিচার্জ করেই ক্ষান্ত হয়নি, যৌন নিপীড়নসহ অনেক বর্বরোচিত হামলা চালায়। অনেক আন্দোলনকারীকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। এটাই ছিল ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ফোর্সের প্রথম ব্যবহার। নিরস্ত্র নারীদের ওপর পুলিশের এই হামলার পরপরই এ্যাসকুয়িথের গাড়ি ভাংচুর করা হয়। এবং এই ঘটনায় সেই সময়কার হোম সেক্রেটারি উইনস্টন চার্চিল হতবুদ্ধ হয়ে পড়েন। নিরস্ত্র নারীদের ওপর পুলিশের এই হামলায় সর্বত্র ছিছি রব উঠে যায়। ওই আন্দোলনে দুজন নারী প্রাণ হারিয়েছিল। দিনটিকে ব্ল্যাক ফ্রাইডে হিসেবে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনায় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এ্যাসকুয়িথ অনেকটা বাধ্য হয়েই 'সাফরাজেট বিল' অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেন। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯১৮ সালে সীমিত আকারে এবং তার এক দশক পর নারীরা সম্পূর্ণ ভোটাধিকার পায়।[146]

৭.৪.২ মিস আমেরিকা, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে মিস আমেরিকার অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ছিল আটলান্টিক শহরে। কিন্তু ওই সুন্দরী প্রতিযোগিতাকেই নারী অধিকার আদায়ের চার শতাধিক কর্মী তাদের আন্দোলনের মোক্ষম সময় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। আন্দোলনটা অনেকটা হাস্যকরধর্মী হলেও তা ছিল নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। এই আন্দোলনে নারীরা তাদের ব্যবহৃত সামগ্রী যেমন হাই হিল, আইলেশসহ নানাধরনের কসমেটিকস, রান্নার জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলেছিল। এসব জিনিস নারী মুক্তির অন্তরায় এমন বিবেচনায় তারা সেগুলো ছুড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। নারীরা কেবল সৌন্দর্য প্রকাশের কোন পণ্য নয়, তারাও পুরুষের মতো মানুষ। তাদেরও সমাজে

[146] Southard, Barbara, The Women's Movement and Colonial Politics, The University Press Limited, 1996; Ferdous Azim, Women's Movement in Bangladesh;

রয়েছে সমান অধিকার। এ বিষয়টিকে বিশ্ব বিবেকের কাছে জাগ্রত করে তোলাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এই আন্দোলনের বিশেষ দিক ছিল আন্দোলনকারী নারীরা তাদের বক্ষবন্ধনীগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল।

৭.৪.৩ আইসল্যান্ড, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৫

এ দিনে আইসল্যান্ডের নব্বই শতাংশ নারী-পুরুষের নির্যাতন, পুরুষকর্তৃক শ্রমের অবমূল্যায়নসহ নারীর প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যর প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। একদিনের জন্য তারা কোন ধরনের কাজে যায়নি। চাকরি, রান্না-বান্না, ধোয়া মোছা থেকে শুরু করে শিশু পালন পর্যন্ত সকল ধরনের কাজে তারা সেদিন ইস্তফা দিয়েছিল। সকল শ্রেণীর সকল বয়সী প্রায় পঁচিশ সহস্রাধিক নারী ঘর থেকে বেরিয়ে লিকজারটোরগ স্কয়ারে জমায়েত হয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তুলেছিল পুরো স্কয়ার। পুরুষের সমান মজুরিসহ সমাজে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণে সেদিনকার সেই আন্দোলন ব্যাপক ফলপ্রসূ হয়েছিল। এরফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নারীকে সমান মূল্য দেয়া শুরু হয়ে যায়। ওই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আজ চল্লিশ বছর ধরে আইসল্যান্ডে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত হয়ে আসছে। লৈঙ্গিক সমতার দিক থেকে আইসল্যান্ড বিশ্বে শীর্ষে অবস্থান করছে যা এই আন্দোলনেরই ফসল।[147]

৭.৪.৪ উইলসডন, নর্থ লন্ডন, ১৯৭৬-৭৮

উইলসডনের গ্রুনউইক ফিল্ম প্রসেসিং ল্যাবরেটোরিতে এশিয়ান এবং পশ্চিম আফ্রিকান নারীদের প্রতি যে জাতিগত এবং নারী বিদ্বেষের প্রদর্শন করা হতো তার বিরুদ্ধে ছিল এই আন্দোলন। অভিবাসী নারীদের বিশেষ করে এশিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার কালো নারীদের কম মজুরি দেয়াসহ বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়ন ও অধিকার খর্বের প্রতিবাদে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জায়াবেন দেশাই। আন্দোলনকারীদের প্রতি পুলিশি হামলা হয়েছিল। লৌহমানবী থ্যাচারের সরকার এ কারণে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। এ আন্দোলনকে

[147] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন; বাঙালি নারী: হাজার বছরের বাঙালি নারী*।

নিয়ে ক্রিস থমাস 'দ্য গ্রেট গ্রুনউইক স্ট্রাইক-এ হিস্ট্রি' নামের সিনেমাও তৈরি করেছেন। এই আন্দোলনের কারণে দীর্ঘমেয়াদে এশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের অভিবাসী নারীদের কর্মক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত হয়।

৭.৪.৫ আফগানিস্তান, মে ২০০৭

মালালাই জোয়া এই দিনটিতে আফগানিস্তানের পার্লামেন্ট লয়াজিরগায় যুদ্ধপ্রভু এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিপক্ষে সাহসী বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি পার্লামেন্টে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বেরই কেবল সমালোচনা করেননি, তিনি তাকে সমর্থনকারী পশ্চিমা প্রভুদেরও কড়া সমালোচনা করেন। নারী পার্লামেন্ট সদস্য জোয়া বলেছিলেন, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন, আর তাদের ঘৃণা করি যারা ষাট হাজারের মতো নিরীহ মানুষ হত্যার জন্য দায়ী। তাঁর বক্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়ে পার্লামেন্টের পুরুষ সদস্যরা কেবল গালাগালি, পানির বোতল তার দিকে ছুড়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাকে শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করে। এবং জোয়াকে পার্লামেন্ট থেকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এই ঘটনায় পুরো আফগানজুড়ে তুমুল প্রতিবাদের জোয়ার সৃষ্টি হয়। তালেবান আমলে গৃহবন্দী নারীরা কারজাই শাসনামলে অল্পবিস্তর অধিকার লাভ করা শুরু করলেও তা যথেষ্ট ছিল না।[148]

৭.৪.৬ ব্যাঙ্গালোর, ইন্ডিয়া, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

কট্টরপন্থী শ্রী রাম সেনার চল্লিশজনের মতো সদস্যে ম্যাঙালোরের 'এ্যামনেশিয়া' নামের একটি বারে ঢুকে সেখানে অবস্থানরত নারীদের মারদোর করে। দিনটি ছিল ২৪ জানুয়ারি, ২০০৯। নারীরা সিগারেট-মদ খেয়ে নাচ-গানের মাধ্যমে বেহায়াপনা করে ভারতের ঐতিহ্যকে ভূলণ্ঠিত করছে, এমন অভিযোগ এনে তারা নারীদের ওপর বর্বোরোচিত হামলা চালায়। এতে দুজন নারী গুরুতর আহত হয়। এই আক্রমণের দৃশ্য ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রাম সেনার বিরুদ্ধে পিঙ্গ চাড্ডি তথা গোলাপী জাঙ্গিয়া নামের অভিনব এক আন্দোলন গড়ে

[148] Southard, Barbara, The Women's Movement and Colonial Politics, The University Press Limited, 1996; Ferdous Azim, Women's Movement in Bangladesh;

ওঠে। ভালবাসা দিবসে প্রমোদ মুত্তালিকের রাম সেনাদের গোলাপী জাঙ্গিয়া তথা পিংক চাড্ডি উপহার দেয়ার জন্য আন্দোলনকারীরা সবাইকে আহ্বান করে।

৭.৪.৭ কাম্পালা, উগান্ডা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

উগান্ডা সরকার নারীদের মিনিস্কার্ট পরা নিষিদ্ধ করলে এর প্রতিবাদে পুরো নারীরা আন্দোলনে নামে। মিনিস্কার্ট নিষিদ্ধ করার পর দেশটিতে নারীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা শুরু হয়। অথচ দেশটিতে মিনিস্কার্ট পরা ঐতিহ্যরই অংশ। কিন্তু স্বৈরাচারী লোকোডোর সরকার এ্যান্টি পর্নোগ্রাফি এ্যাক্টের অধীনে এই আইন জারি করে। যেসব নারী মিনিস্কার্ট পরে রাস্তায় বের হয়েছিল, তাদের সরকারের লোকজন জনসমক্ষে নগ্ন করে শাস্তি দেয়া শুরু করে। পুরুষ কর্তৃক নারীদের হয়রানি এবং মিনিস্কার্ট নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে দু'শতাধিক নারী ন্যাশনাল থিয়েটারের সামনে জড়ো হয়ে আন্দোলন চালায়।[149]

৭.৪.৮ লিমা, পেরু ৭ মার্চ, ২০১৪

বিশ্ব নারী দিবসের ঠিক আগের দিন দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমাতে নারী অধিকার আদায়ের কয়েক হাজার কর্মী লাল পোশাক পরে নারীবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামনে জড়ো হয়ে আন্দোলন শুরু করে। তারা নারীর প্রতি পুরুষের শারীরিক নির্যাতন, নির্যাতনকারীদের কোন বিচার না হওয়াসহ নারীর প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে এই আন্দোলন করে। তাছাড়া সরকার কর্তৃক নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদও এই আন্দোলনের মাধ্যেমে করা হয়েছিল। এই আন্দোলনে তারা লাল পোশাক পরে আধিবাসী নৃত্য করে।

৭.৪.৯ বেজিং, চীন, মার্চ ২০১৫

এ বছরের মার্চে বিশ্ব নারী দিবস যেন বেইজিংয়ে পালিত হতে না পারে, এজন্য চীনের পাঁচটি সন্ত্রাসবাদী গেরিলাগোষ্ঠী হুমকি দিয়েছিল। এরা পোগ্রাম বাতিল করার জন্য উদ্যোগও নিয়েছিল। কিন্তু নারী দিবসের আগেই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই গ্রেফতার করার কাজটিকে ত্বরান্বিত করেছিল দেশটির নারী অধিকার

[149] Southard, Barbara, The Women's Movement and Colonial Politics, The University Press Limited, 1996; Ferdous Azim, Women's Movement in Bangladesh;

কর্মীদের আন্দোলন। তারা শুধু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেনি, দেশের সরকারের পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিল। বিশেষ করে কর্মস্থলে যৌন হয়রানির বিষয়টি তাদের আন্দোলনে গুরুত্ব পায়। সাদা বিয়ের পোশাকে তারা রাস্তায় মিছিল করে।[150]

৭.৪.১০ লন্ডন, ৭ অক্টোবর, ২০১৫

লন্ডনের লেইসিস্টার স্কয়ারের ওডিওন সিনেমাহলে 'সাফরাজেট' নামের সিনেমার প্রিমিয়ারে সিস্টারস আনকাট নামের সংগঠনের শতাধিক কর্মী ব্যারিয়ার তথা প্রতিবন্ধককে উপেক্ষা করে লাল কার্পেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স তথা গৃহ নির্যাতনের প্রতিবাদ জানায়। আন্দোলনকারীদের ঠেলে, ধাক্কিয়ে এমনকি শারীরিক হয়রানির মধ্যদিয়ে বের করে দেয়া হয়। সিনেমাহলের বাইরে বোম্বিংও হয়। আন্দোলনকারীরা বলতে চেয়েছিল, কেবল ভোটাধিকার অর্জনের মধ্য দিয়েই নারীর সকল অধিকার অর্জিত হয়েছে, এমনটি নয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক বাকি। আন্দোলনকারীরা বুঝিয়ে দিয়েছেন এ সমাজে এখন চরমভাবে নারী বৈষম্য বিদ্যমান। নারী-পুরুষ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

৭.৫ আন্দোলন সংগ্রামে নারী

নারী আন্দোলনের পিছনে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান তা হলো দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বৈশ্বিক পটভূমিতে যেমন একথা সত্য তেমনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বাংলার নারীরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়ে আসছে। ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে গৃহের অভ্যন্তরে অন্তরীণ করে রেখেছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই নারীরা উপেক্ষিত। তবে ব্যক্তিপর্যায় কিছু নারী তাদের কর্মকা-ের স্বীকৃতি পেয়েছিল বটে, যেমন- রাজশাহীর রানী ভবানী ও ঝাসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ। তবে সাধারণ নারীর পক্ষে তাদের মতো স্বীকৃতি পাওয়া ছিল দুরূহ ব্যাপার। উনিশ শতকের শুরুতে বাংলায় নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হতে থাকে। বিশেষ করে এ সময় বাংলার রেনেসাঁ বা

[150] হক, মাহমুদ শামসুল। বাঙালি নারীঃ হাজার বছরের বাঙ্গালী নারী, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০।

নবজাগরণের মানবিক আবেদন থেকে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরে নারী আন্দোলনের ইতিহাস বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুগপৎভাবে অগ্রসর হয়। এ সময় বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এভাবে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে দেশপ্রেমের মধ্যদিয়ে। বিদেশি শাসক ও শোষকদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে এদেশের নারী সমাজ বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এসে যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সামরিক শাসন উচ্ছেদের লড়াইয়ে।

বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা :

১। ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭)

২। পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

৩। বাংলাদেশ আমল (১৯৭১-বর্তমান)

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে শাসনের নামে প্রায় দুশ' বছর শোষণ করেছে। এ সময় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অধিকার বঞ্চিত ছিল। ফলে জনগণের মধ্যে ক্রমশ ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে। এভাবে সমাজে সামগ্রিকভাবে এক ধরনের সচেতনতা জাগ্রত হয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, এ সময় ভারতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উদার মনোভাবসম্পন্ন কিছু নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। যাদের সহযোগিতায় বাংলার নারী আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এসব উদার মনোভাবসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ডাক দেয়। এই রেনেসাঁর মানবকল্যাণমুখী জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নারী জাগরণ। এ উদার মনোভাবসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি রেনেসাঁর মানবিক আবেদন থেকে নারী সমাজের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসেন, প্রতিবাদ জানান এবং নারী নিপীড়ন বন্ধের জন্য

রাষ্ট্রীয় আইন তৈরির পক্ষে আন্দোলন করেন। এই আন্দোলন সমাজ সংস্কারমূলক হলেও বাংলায় নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।[151]

৭.৬ নারীমুক্তি আন্দোলনে সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকা:

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) প্রমুখ সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। নতুন যুগ ও নতুন আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলার জন্য তারা যে কাজ করে গেছেন তার একটি অংশ ছিল নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করা ও নারীকে শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা। উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গে নারী জাগরণের সম্পর্ক এভাবেই অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে।

চিন্তায়, চেতনায় ও মননে নিজ যুগের চাইতে অগ্রসরমান রামমোহন রায় একই সংগ্রাম করেছেন জীবনভর। সমাজের চলিত ধ্যান-ধারণা, নারী নিপীড়নের জন্য চলিত সমস্ত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি হয়েছিলেন নারী সমাজের বন্ধু এবং রক্ষাকর্তা। সামাজিক আচার-আচরণ ও বিধিনিষেধের মধ্যদিয়ে নারী সমাজের প্রতি মর্যাদাহীনতা প্রকাশিত হতে দেখে তিনি সামাজিক সব ধরনের প্রথা যেমন- বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য ও অধিবেদন প্রথা আইন করে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। অসহায় বিধবাদের জন্য অর্থ তহবিল গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। এ ছাড়া তার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আত্মীয় সভার অধিবেশনে বাল্য বিধবাদের বাধ্যতামূলক বৈধব্য নয়তো সহমরণ, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা প্রস্তাব থাকত।

নারী নির্যাতনের মূল কারণ খোঁজ করে তিনি দেখিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে নারী অন্যের ওপর নির্ভরশীল বলেই নারীরা অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকছে। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার অর্থনৈতিকভাবে নারীকে স্বাবলম্বী করা।

[151] Ahmed, A. B. Sharfuddin. Bizna: A Study of power structure in contemporary rural Bangladesh. Bangladesh Books International Ltd. Dhaka, 1983.

নারী জাগরণে রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ ভূমিকার একটি অংশ হচ্ছে সতীদাহ প্রথা বন্ধে সাফল্য অর্জন। যদিও ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন তবু সমাজ সংস্কারে তার দৃঢ়চেতামন সক্রিয় ছিল বলেই সতীদাহের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য তার আন্দোলন সমাজে প্রসারিত হয় এবং তা সাফল্য লাভ করে। ১৮৮৫ সালের শুরুতে তিনি কলকাতায় এসে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ১৮১৩ সালে লর্ড ময়রা সতীদাহ প্রথা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নির্দেশ জারি করেন এবং ১৮১৭ সালে তা চূড়ান্ত রাজবিধি হিসেবে প্রচারিত হয়।[152]

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কাছে এ সতীদাহের একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। কলেরায় মৃত এক যুবকের বিধবা পত্নী চিতার আগুন দেয়ার পর সবার অলক্ষ্যে চিতা থেকে নেমে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। শ্মশান যাত্রীরা চিতার মধ্যে সতীকে না পেয়ে জঙ্গল থেকে টানতে টানতে এনে এক ডিঙি নৌকায় করে মাঝ নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে মারে।

এ ঘটনায় দেশের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রামমোহন রায়ের দল ও কলকাতাবাসী ইংরেজরা প্রতিবাদ করেন। তখন বড়লাট ছিলেন লর্ড আর্মহাস্ট। এতবড় নিষ্ঠুর ঘটনার পরও তিনি সতীদাহ প্রথা বন্ধের আইন জারি করতে সাহস করেননি। তবে আরো কিছু কঠোর নিয়ম জারি করে সতীদাহকে নিয়ন্ত্রিত করলেন তিনি।

৭.৭ নিয়মগুলো ছিল এরকম:

- কোনো সহমরণ নারীকে মৃত পতির সঙ্গে ছাড়া অন্যভাবে দাহ করা যাবে না বা অন্য কোনোভাবে হত্যা করা যাবে না।
- সহমরণকামী বিধবাকে নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে অনুমতি নিতে হবে, অন্যের মাধ্যমে অনুমতি নিলে হবে না।
- বিধবার সহমরণে সহায়ক কোনো ব্যক্তি চাকরি পাবে না।

[152] Ahmed, A. B. Sharfuddin. Bizna: A Study of power structure in contemporary rural Bangladesh. Bangladesh Books International Ltd. Dhaka, 1983.

- সহমৃতা বিধবাপতির কোনো সম্পত্তি থাকলে তা সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।

সমাজের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম করে প্রতিরোধ আন্দোলন ও সংগ্রাম করেই রামমোহন রায় নিশ্চুপ হননি। তিনি হিন্দু শাস্ত্র থেকে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে বহু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে এটাই প্রমাণ করলেন যে, বিধবার সহমরণ শাস্ত্র অনুমোদন করেনি এবং বিধবার শুদ্ধাচারের কথাই শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৯ সালের ৪ জানুয়ারি লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ডিক্রি জারি করলেন।[153]

বাংলার নারীর বাঁচার অধিকার পেল রামমোহন রায়ের কাছ থেকে। আর শিক্ষা সম্মান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচার পথ খুঁজে পেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রধান পুরুষ রামমোহন রায় এবং দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' ও 'বিধবার পুনর্বিবাহ' বিষয়ে বহু লেখালেখি, তর্ক উত্থাপন ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা করে সফল হয়েছেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০টি বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এসব বিয়ের খরচ বাবদ ৮২ হাজার টাকার দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করেছিলেন। এজন্য ৫০ হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল। এই ঋণের কথা শুনে তাকে ঋণমুক্ত করার জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট ও এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরা এবং কয়েকজন ব্যক্তি বিধবা বিবাহ তহবিল খোলার উদ্যোগ নিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আপত্তি জানান। সেজন্য এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেই সমস্ত ঋণ শোধ করেন। শুধু বিধবা বিবাহের সমর্থনেই নয়, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্দোলন করেছেন। বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য বহু আন্দোলনের পর ১৮৬০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সহবাস সম্মতি আইন জারি হয়। সে আইনে মেয়েদের সর্বনিম্ন বিয়ের বয়স ১০ বছর। যেসব বিবাহিত মেয়েদের বয়স ১০ হয়নি তাদের সহবাসকে পাশবিক অত্যাচার হিসেবে গণ্য করা হতো। নারী শিক্ষায় মিশনারিদের উদ্যোগ : সমাজ সংস্কারমূলক উদ্যোগ নিয়ে নারী সমাজের দুর্গতি দূর করার জন্য উনিশ শতকের পুরো সময়জুড়ে বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্যোগে সৃষ্টি

[153] গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া (সম্পাদক)। নারীঃ রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে এদেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য তৎপরতা। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই নারী শিক্ষার উদ্যোগে সর্বপ্রথম, যদিও খ্রিস্টধর্মের প্রসারই ছিল মূল লক্ষ্য। ১৮১১ সালে প্রায় ৪০ জন বালিকা নিয়ে উইলিয়াম কেরি মার্শম্যানও ওয়ার্ড ধর্মশিক্ষার জন্য প্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। ১৮১৮ সালে চুঁচড়ায় বালিকাদের জন্য আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির রবার্ট মে। এরপর স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের স্ত্রীদের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালের মে-জুন মাসে কলকাতায়। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'দি ফিমেল জ্যুভেনাইট সোসাইটি'। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেয়ার জন্য জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ছাত্রীদের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রথমে গৌরিবাড়ীতে একটি, পরে আরো কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এসব স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা প্রথম বছর ছিল ৮, দ্বিতীয় বছর হয়েছিল ৩২। ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগে পরিচালিত মেয়েদের স্কুলগুলো খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিত। এ কারণে হিন্দু সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা এসব স্কুলে পরিবারের মেয়েদের পড়াতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এ সংকট দূর করার জন্য এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বীটন বা বেথুন উদ্যোগী হয়ে ১৮৪৯ সালে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যা বেথুন বালিকা বিদ্যালয় রূপে পরিচালিত হয়ে ওঠে। পরে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় অনুসরণে বহু স্কুল খোলা হয়।[154] ১৮৫৭-১৮৫৮ এর মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলার মেয়েদের জন্য ৩৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্কুলগুলোতে আনুমানিক ১ হাজার ৩০০ ছাত্রী পড়ত, ৬ হাজার ১৪৫ টাকা মাসিক খরচ হতো। স্কুলগুলোর খরচ চালানোর জন্য বহু দেশি-বিদেশি শুভানুধ্যায়ীরা চাঁদা দিতেন। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পড়ার জন্য ঘরে ও স্কুলে ব্যবস্থা করার উদ্যোগ বেড়ে যায়। ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে ২৮৮টি স্কুলে ৬ হাজার ৮৬৯ জন্য ছাত্রী পড়াশোনা করেছে। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করে।[155] প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেয়েদের সাফল্য লক্ষ্য করে ১৮৭৯ সালে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। উল্লেখ্য, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বেথুন কলেজকে ১৮৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু বেথুন কলেজ

[154] নারী জাগরণের শত বছর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০।

[155] বেগম, মালেকা। রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল। আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মহিলাদের মধ্যে স্নাতক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। নারী শিক্ষার ইতিহাসে ১৮৮৩ সাল স্মরণীয় ও উজ্জ্বল একটি বছর। নারী জাগরণে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা : রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮২৮ সালে। নারীরা সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তার যেসব পদক্ষেপ আত্মীয় সভার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেছিল তার বিস্তৃতি ঘটেছিল ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে। সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে মেয়েদের শিক্ষা চালু করা ও অবরোধ প্রথা দূর করার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সমাজে আশ্রয়হীনা, পতিতা, বিধবা, অত্যাচারিত মেয়েরা ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় পেত। পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৬ সালে। পরে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ গড়ে উঠেছিল। এসব ব্রাহ্মসমাজের মূল উদ্যোক্তারা নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী সমাজের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তবে এরা মূলত নীতি শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র নারী জাগরণের সূচনা ঘটে। মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয় মেয়েদের শিক্ষা দেয়া, বিধবা বিবাহের প্রসার করা, কুলীন বিয়ে বন্ধ করা প্রভৃতি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলার ব্রাহ্মণরা নারীকে সমাজের দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং নারী প্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে সাহায্য করেছেন। বাংলার নারীদের জাগরণের সূচনাপর্ব এভাবেই শুরু হয়েছিল। গুরুচরণ মহালাবনিশ প্রথম ব্রাহ্মণ যিনি সামাজিক নিপীড়নের হাত থেকে জনৈকা হিন্দু বিধবাকে মুক্তি দেয়ার জন্য বিয়ে করেছিলেন।[156] তার বাড়িতে প্রায় ৩০ জন হিন্দু কুমারী ও বিধবা সামাজিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। এজন্য তাকে অনেক বিপদ ও ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। এভাবে ব্রাহ্মসমাজ নিপীড়নের হাত থেকে নারী সমাজকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলাদেবী চৌধুরাণী, পণ্ডিত রমাবাঈ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে স্যার সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভি, মীরনাসির আলী তিতুমীর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ, আমীর আলী প্রমুখ মুসলিম নর-নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। এদিকে প-িত রমাবাঈ, রমাবাঈ রানাডে, আনন্দিবাঈ যোশী, ফ্রান্সিসিয়া সোরাবজী, এ্যানি জগন্নাথ, রুমোবাঈ প্রমুখ

[156] গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া (সম্পাদক)। নারীঃ রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

শিক্ষিত নারী শিক্ষা ছাড়াও নারীদের নার্সিং শিক্ষা ও ডাক্তারি শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন। এভাবে অল্পসংখ্যক সমাজ সংস্কারক এবং কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষ করে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এরই ফলে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগে নারীরাও অংশ নিতে আগ্রহান্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে সালমা খান বলেছেন, দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনুসৃত ও সমর্থিত নীতিমালার ওপরই নির্ভর করে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ততা। উনিশ শতকের শেষভাগে কংগ্রেস বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার সাধনে অংশ নেয়। অন্যদিকে, মুসলিম লীগে কিছু মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় যদিও তারা গতানুগতিক প্রথা বা ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী : ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন বাংলার নারীরাও সে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। একদিকে নিজস্ব অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য বাংলার অকুতোভয় নারীরা অনেক নির্যাতন, অত্যাচার ও জেল-জুলুম সহ্য করেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হন। এ সময় নারীমুক্তি আন্দোলন ও ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলন একাত্ম হয়ে যায়। নিম্নে বিভিন্ন আন্দোলনে নারীদের আন্দোলন তুলে ধরা হলো : স্বদেশী আন্দোলনে নারী : স্বদেশী আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বহুসংখ্যক নারী যুক্ত হয়েছিলেন। তখন ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলন দুই ধারায় চলছিল। জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সশস্ত্র আন্দোলন।[157]

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দুই ধারার মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হওয়া নারী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন সরজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, নেলীসেন গুপ্ত, মোহিনী দেবী, আশালতা সেন, সরযু সেন, প্রফুল্লমুখী বসু, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, লাবণ্যপ্রভা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়

[157] নারী জাগরণের শত বছর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী নারী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। এতে বহু নারী গান্ধীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। নারীরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নানারকম দেশাত্মবোধক গান গেয়ে নিজেদের মধ্যে উত্তাপ ছড়াতেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। দলে দলে দেশি কাপড়ের জন্য চড়কার সুতা কাটতে শুরু করেছিল। এ পদক্ষেপ শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যদিয়ে আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছিল।

৭.৮ অসহযোগ আন্দোলনে নারী

১৯২১ ও ৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনেও নারীদের সাহসিক কর্মকা- ছিল উল্লেখ করার মতো। এ সময় গান্ধীজি নারী সমাজের মধ্যে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন। বাসন্তী দেবী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহধর্মিণী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তার পরিবারের সদস্য নিয়ে। ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে এলে হরতাল কর্মসূচি দেন। এতে সভাস্থল থেকে বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, সুনীতি চৌধুরীসহ ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে জনতার প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বাসন্তী দেবীকে সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।[158] সারা বাংলায় সে সময় থেকেই নারীরা জাগরিত হতে থাকে রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে। উর্মিলা দেবী নারীকর্ম মন্দির নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। সেখানে বহু নারীকে নেতৃত্বের পর্যায়ে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সংগঠনের কর্মকান্ডের প্রভাবে ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে হেমপ্রভা মজুমদার, সুনীতি দেবী, আশালতা সেন, নেলীসেন গুপ্ত, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সরলতা গুপ্ত, দৌলতুন্নেছা প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ হন। সমগ্র দেশের বিভিন্ন গ্রামে শহরে নারীর অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি করে মহিলা সমিতি গঠন করে রাজনৈতিক কর্মকর্তা যুক্ত হতে থাকেন। এভাবে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ও প্রভাবে সিলেটের সরলাবালা দেবী, দিনাজপুরের বালুরঘাটের প্রভা চট্টোপাধ্যায়, ভোলার সুরবালা সেন, বরিশালের ইন্দুমতী গুহ

[158] অগাস্ট বেবেল। নারীঃ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। কলকাতা, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরতা, নোয়াখালীর সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহাশীলা চৌধুরী, বর্ধমানের সুরমা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নারী নিজ নিজ অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে ব্যাপক নারীসমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে বহু কর্মকা- পরিচালনা করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি অনুসারে ব্রিটিশ পণ্য বর্জিত হয়। সরকারি উপাধি বা খেতাব বর্জন, সরকারি দরবার পরিহার, সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন, ব্রিটিশ আদালত বর্জন, সৈন্য সংগ্রহে অসম্মতি, কাউন্সিল বর্জন, বিলাতি দ্রব্য পরিহার প্রভৃতি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মতো।

৭.৯ খিলাফত আন্দোলনে নারী :

ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি চলেছে খিলাফত আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি একত্রিত হয়ে খিলাফত আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয়। খিলাফত আন্দোলনের মধ্যদিয়ে মুসলিম নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। অসাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদের অন্যতম শওকত আলী ও মওলানা মোহাম্মদ আলী সুপরিচিত ছিলেন। তাদের মা বিবি আম্মা (বি-আম্মা) এসব সভায় ভাষণ দিতেন।[159] তার এই ভাষণে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম, অভিজাত নারীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনের জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম নারী এই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে ও কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নারীরা খিলাফত আন্দোলনের সভাগুলোতে যোগ দেন। সভাস্থলে বন্দেমাতারম ও আল্লাহ আকবর উভয় ধ্বনি উঠেছিল। মহিলারা পুরুষ সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানাতেন। সন্তানদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতেন ও অর্থ তহবিল সংগ্রহ করতেন। কংগ্রেসের এক সভায় বি-আম্মা উর্দুতে দেয়া ভাষণে বলেন, দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে স্বামী পুত্রদের পাঠাতে হবে জেলে এবং নিজেদেরও ভয় দ্বিধা পরিহার করে বরণ করে নিতে হবে কারাগার। আমার সন্তানরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেছে। সেজন্য জননী হিসেবে আমি গৌরববোধ করছি। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার কাজে বি-আম্মা তার দুই

[159] নারী জাগরণের শত বছর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছিলেন। বি-আম্মার এই উদ্দীপ্তমূলক ভাষণে বাংলার মুসলিম জনগণের মধ্যে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়ার প্রেরণা জাগে। মৃত্যুর তিন বছর আগে এক জনসভায় বি-আম্মা ভাষণ দেয়ার সময় সর্বপ্রথম তার বোরকা ত্যাগ করেন। তিনি বলেছিলেন যে, তারা সবাই তার ভাই ও সন্তানের মতো। তাই তাদের সামনে পর্দা করার কোনো প্রয়োজন তিনি দেখেন না। এভাবে তার এই পদক্ষেপ মুসলিম নারী সমাজকে অবরোধ থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে। আইন অমান্যকারী আন্দোলনে নারী : কংগ্রেসের আহ্বানে ও উদ্যোগে সারা বাংলায় ১৯২৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত ব্যাপক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এসব আন্দোলনের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজির নেতৃত্বে এসব আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। সিলেট কংগ্রেসের উদ্যোগে 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ' গড়ে উঠেছিল ১৯৩০ সালে। এর সভানেত্রী ছিলেন জোবেদা খাতুন চৌধুরী। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে সিলেটের শত শত নারী ৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পথ নেমেছিলেন। প্রায় ৬০ জনের মতো মহিলাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নারীরাও দলে দলে লবণ সংগ্রহের কাজে যোগ দেন। যে কোনো জেলায়, যে কোনো অঞ্চলে মহিলারা সভায় যেতেন জাতীয় পতাকা হাতে। জাতীয় পতাকা ওড়ানো নিয়ে পুলিশের সঙ্গে মহিলাদের বিরোধ বেধেই থাকত। এর ফলে বহু মহিলা গ্রেপ্তারও হতেন। স্বাধীনতার শপথ নিয়ে হাজার হাজার মহিলা আইন অমান্য আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নারীরা পাবলিক মিটিং ও মিছিল করার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতেন। তারা প্রভাতফেরি, জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান বাঁধতেও কার্পণ্য করেননি। সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হেনসা মেহতার নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশত নারী তিলকের মৃত্যুবার্ষিকীতে যোগদান করে। এমনকি আইন পরিষদের একজন সদস্য আনাসুয়া বাই তাঁর সদস্যপদ প্রত্যাহার করে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। বরিশালের মনোরমা বসু (১৮৯৭-১৯৮৬) আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন। তেভাগা আন্দোলনে নারী : অবিভক্ত বাংলার ১৩টি জেলার লক্ষ লক্ষ কৃষকের রক্তস্নাত তেভাগা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে (১৯৪৫) থেকেই জোতদার-জমিদার এর লাঠিয়াল বাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে সংগ্রামে কৃষক রমণীরা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকায় কৃষক আন্দোলনের নেতা রমেন মিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ও ইলা মিত্রের নেতৃত্বে যে তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে সেই আন্দোলনে নারীদের প্রাণপণ লড়াই ও আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে ঠাকুরগাঁও মহকুমার অটোয়ারী থানার রামপুর গ্রামের কৃষকরা বর্গাদারের ধান কেটে আধিয়ারের বাড়িতে তোলা শুরু করলে বহু কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তা সত্ত্বেও ধান কাটা বন্ধ হয়নি। আবার পুলিশ আক্রমণ করতে এলে ওই গ্রামের রাজবংশী মহিলা দীপেশ্বরী লাঠি হাতে পুলিশকে তাগড়া করলে পুলিশ ভয় পেয়ে পিছু হঠে যায়। দীপেশ্বরীর এই বীরত্বমূলক প্রতিরোধের মুখে পুলিশের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা সব তেভাগা আন্দোলনকারীদের মধ্যে অণুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এলাকায় বহু মহিলা কৃষককর্মী আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিলেন। পুলিশের আক্রমণে পুরুষকর্মীরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ধান কাটা ও কৃষকের গোলাতে ধান তোলার কাজে জয়মণির নেতৃত্বে শত শত মেয়ে পুরুষ কৃষকদের আগে থাকত।[160] এজন্য মেয়েদের ওপর অনেক ধরনের নির্যাতন নেমে আসত। চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হয়েছিল। তবে নারীর সাহসিকতার মাধ্যমে এগুলো মোকাবিলা করেছিল। রংপুর, জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জ, যশোরের নড়াইল এলাকার বাকড়ি, দেগোছা, কমলাপুর, ঘেড়োনাচ, হাতিয়ারা, গুয়াখোলা, বেলাহাটি ইত্যাদি গ্রামে তেভাগার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। গুয়াখোলা গ্রামের শত শত মহিলাকে নিয়ে ঝাঁটা বাহিনী গড়ে তোলেন। এরা শুধু ভলান্টিয়ার কাজ করতেন তা নয়, এরা দুর্ধর্ষ ও কৌশলী নেত্রী হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। ঢাকা জেলাতেও বিভিন্ন গ্রামে তেভাগা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে মহিলারা সংগঠিত হয় এবং তারা বীরত্বের সঙ্গে পুরুষকর্মীদের পাশে লড়াই করতে থাকে। তেভাগা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার চাষি মেয়েরা বীরত্বের সঙ্গে ব্যাপকহারে সংগ্রাম করেছে। তেভাগা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে প্রচারক, সংগঠক ও আন্দোলনকারী হিসেবে অনেক মহিলা তৈরি হয়েছে। রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনে অনেক সাঁওতাল মহিলা যোগদান করেছিল। তৎকালীন সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর দুর্বিষহ নির্যাতন চালায় এবং নেত্রী ইলা মিত্রের ওপর চালায় নির্মম অত্যাচার। এতসব কিছু সহ্য করেও কৃষক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত তেভাগা আন্দোলনে বাংলার নারীরা প্রাণপণ লড়াই করেছে, যা

[160] ড. নাজমা চৌধুরী, Women in Politics, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। কৃষক বিদ্রোহ ও নারী : ব্রিটিশ যুগে বাংলার কৃষক আন্দোলনে গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। শুধু অংশগ্রহণ নয়, আন্দোলন পরিচালনায়, সশস্ত্র সংগ্রামে, ত্যাগ স্বীকারে, শত্রু মোকাবিলায়, সংগঠন গড়ে তোলায় কৃষক রমণীরা যেমন শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দেখিয়েছেন সাহস ও দৃঢ়তা। শুধু তাই নয় কৃষক পরিবারের মহিলারা একই সময় তাদের সামাজিক, পারিবারিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যে ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় টংক, নানকার আন্দোলন হয়েছে। এসব আন্দোলন একদিকে যেমন ছিল জোতদার জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম, তেমন অন্যদিকে ছিল ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। ব্রিটিশ সরকার ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন জারি করে মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুর বদলে নতুন সামন্তপ্রভু সৃষ্টি করল, এরা হলো জমিদার। এই জমিদাররা শহরের মানুষ, গ্রামে জমি রাখতেন। খাজনা আদায়ের জন্য তারা যাদের নিয়োগ করতেন বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে হলেন তালুকদার, জোতদার, হাওলাদার ইত্যাদি মধ্যস্তরভোগী। বংশানুক্রমে চাষ করার যে অধিকার কৃষকের ছিল সে অধিকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। জমিতে লাঙল, বীজ, বলদ, মেহনত কোনো কিছু প্রয়োগ না করেই জমিদাররা ফসলের অর্ধেক নিয়ে নিত। ময়মনসিংহ জেলার কমলাকান্দা, সুসংদুর্গাপুর, নালিতাবাড়ী, এমন স্থানে কৃষকের ওপর আরো বেশি শোষণ চলত টংক প্রথার মাধ্যমে। টংক মানে ধান কড়ারি খাজনা। ধান উৎপন্ন হোক বা না হোক কড়ার ধান জমিদারকে দিতে হতো। টংক জমিতে কৃষকের কোনো অধিকার ছিল না। নানকার প্রথার মাধ্যমে কৃষকদের ওপর নানারূপ অত্যাচার করা হতো, নানকার প্রথা হচ্ছে অর্ধ দাসপ্রথা। সামান্য জমি ও আশ্রয়ের পরিবর্তে জমিদার বাড়িতে সারাবছর বেগার খাটতে হতো নানকার প্রজাদের। কিন্তু তারা কোনো মজুরি পেত না।[161] এই ব্যবস্থায় শুধু অর্থনীতিই যে ভূস্বামীদের করায়ত্ত হলো তাই নয়, গ্রামীণ সমাজনীতি ও শাসননীতিও তাদের হাতে পরিচালিত হতে থাকল। জমিতে চাষ

[161] *Desai, Neera. Indian womwn and Media. Bombay Research Unit on Development Studies, SNDT Women's university 1983.*

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য যে কৃষকের অনুমতি মিলত তাকে তার পরিবারের সব সদস্যসহ জোতদার, মহাজন এবং জমিদার প্রত্যেকের কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করতে হতো। জমিদার, মহাজন, জোতদার স্বেচ্ছাচার করে যেমন গরিব চাষির ফসল কেড়ে নিত, তেমনি ঘরের বউঝিকেও কেড়ে ভোগ করত, নির্যাতন করত। খাজনা বাকি রেখে বা খাজনা বাকি পড়লে গরিব চাষিরা বউ, ছেলেমেয়েদের কাচারিতে এনে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করা হতো। অনেক সময় ধনী কৃষকরা অনেক বিয়ে করত নামমাত্র, গরিব চাষির মেয়েকে বিয়ে করে ক্রীতদাসীর মতো ঘর-সংসারের কাজে এদের বেগার খাটানো হতো। গরিব কৃষকরা জীবিকার সন্ধানের বাইরে গেলে বউকে জমিদার বাড়িতে রেখে যেতে হতো। কোর্টকাচারিতে গরিব কৃষকদের বিচার পাওয়ার কোনো পথই ছিল না। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় চাষি, তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবার বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এভাবে অর্থনৈতিব সামাজিক স্বেচ্ছাচারের ফলে অর্থনৈতিক মেরুদ- ভেঙে যেতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অভাব, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতির মরণ ছোবলে এই দরিদ্র নিষ্পেষিত কৃষক সমাজ আরো নিঃস্ব হয়ে পড়ল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠার পর দ্রুতই কৃষক সংগঠিত হলো, নারীরাও স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল। অত্যাচারী জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে নারীদের তীব্র ক্ষোভ পরিণত হলো সংগ্রামে। তারা দুভাবে জোতদারদের হাতে নিগৃহীত হতো।[162] প্রথমত, চাষি পরিবারের একজন হিসেবে স্বামী সন্তানের পরিশ্রমের ফসল অন্যের গোলায় উঠিয়ে দিয়ে, নিঃস্ব হয়ে গিয়ে অভাবে দারিদ্রে সেও নির্যাতিত হতো। দ্বিতীয়ত, শুধু নারী হিসেবে উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচার, জোতদার, জমিদারদের অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হতো। একদিকে সে যেমন জোতদারের কাছে ছিল সম্পত্তির মতো বেচাকেনার সামগ্রী, অন্যদিকে স্বামীর কাছেও ছিল পণ্য। গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠন যখন গড়ে উঠল তখন মেয়েরাও সংগঠনে যোগ দিল, তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। গ্রামীণ মহিলারা ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এলাকাগুলোর টংকবিরোধী ও সিলেট জেলায় নানকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ১৯২২-২৩, পরে ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালেও নানকার প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই হয়েছিল। মেয়েরা লাঠি, দা, বঁটি, বল্লম ছুড়ে সশস্ত্র পুলিশকে প্রতিরোধ করত। এভাবে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ এসব সংকটের ফলে সাময়িকভাবে কৃষক আন্দোলন স্তিমিত

[162] Chabra, Rami. Women and the Media: a feminist view point. *(Indian Express, 23 February 1980)*

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। কৃষক আন্দোলনে মহিলাকর্মীরা কৃষক সভার নেতৃত্বে অংশ নেন মজুতদার বিরোধী খাদ্য আন্দোলনে। হাজার হাজার মহিলা যোগ দিয়েছিল কৃষক সভার ভুখা মিছিলে। ১৯৪৯ সালে অঢ়ধি নামক নারী সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনটি মহিলাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত সচেতনাতা বৃদ্ধি ও অর্থনীতি কর্মকা-ে তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম ও মহিলাদের মধ্যে কাজ করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৫২ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর মহিলা সমাজের ওপরে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বেগম সুফিয়া কামালের মতো মহিলারা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। '৫৪ সালে নির্বাচনে নারী সমাজ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। নারী জাগরণের অগ্রপথিক বেগম রোকেয়ার অবদান নারীর অগ্রযাত্রায় চিরস্বরণীয়। বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহান বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনসহ সব ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সব সময় উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রদান করতেন এবং তাহার ত্যাগ স্বীকার জাতি কখনই ভুলতে পারে না। সুফিয়া কামালকে আমরা নারীর চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধিতে সর্বদা সম্মানের চোখে দেখি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের পর নির্যাতিত নারীদের জন্য বাংলাদেশ উইম্যান রিহ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়। ২০০১ সালে এপ্রিল মাসে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি নারী আসনে ১০ বছর মেয়াদ শেষ হলে নারীদের আসন সংখ্যার বৃদ্ধির দাবি জানায় এবং সরাসরি নির্বাচনের লক্ষ্যে সংগঠিত হয় এবং পরে সরকার তাদের দাবি মেনে নেয়। বর্তমানে নারীরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার ও মন্ত্রিপরিষদ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক, দাপ্তরিক, প্রতিরক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সফলতা অর্জন করে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে।[163]

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। আমার পিতা একজন মহান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আমিরুল ইসলাম ফরহাদ। তাহার সহধর্মিণী আমার মাতা সৈয়দা নাদিরা লাইজু, তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তারামন বিবি, সেতারা বেগমসহ বহু নারী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

[163] Desai, Neera. *Indian womwn and Media. Bombay Research Unit on Development Studies*, SNDT Women's university 1983.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের ভিন্নমত থাকবেই। তবে দেশের স্বার্থে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা আমেরিকা এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের দিকে তাকালে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। আমরা ঠিক এ পর্য্যায়ে না গেলেও নারীর অগ্রযাত্রায় অনেক দূরে এগিয়েছি। তবে গণতন্ত্রের সঠিক চর্চায় ও নারীকে একজন পরিণত মানুষ হিসেবে সমাজে দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমাজপতিদের এগিয়ে আসতে হবে। কখনো মনের ভিতর থেকে কোনো বিষয় উপলব্ধি না করলে আইন করে বা চাপিয়ে দিয়ে কোনো কিছুতে সফলতা আসে না। দেশের ও মানুষের কল্যাণের জন্য গণতন্ত্রের ভিন্নমতকে লালন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নারীকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের সম্নোগান হবে, 'নারী তুমি এগিয়ে যাও এবং গণতন্ত্র তুমি এগিয়ে যাও'। সবার আগে আমার দেশ। সবাই দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হোক এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মহান মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা লালন করে গেছেন সেটা যেন আমরাও সমুন্নত রাখতে পারি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে এটাই আমার একমাত্র চাওয়া।

অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। যেকোন উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্ধেক বাদ দিয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বিধায় নারী-পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, খেলাধুলা, এমনকি বিমানের পাইলট হিসেবেও নিজদের পরিচয় বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে। নারীরা এভারেস্টের চূড়ায় উঠে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা উচু করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিচ্ছে তারাও পারে বিশ্বকে জয় করতে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য সরকারী পর্যায়ে সাংবিধানিক বিধিবদ্ধ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে জাতীয় মহিলা সংস্থা। সময়, কাল ও স্থানিক প্রয়োজনীয়তার সাথে সমন্বয় করে ও প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয় বিধায় বর্তমানে গ্রামীন দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সমবায় সমিতি গঠন ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠাসহ ১১টি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসবের মধ্যে ডে-কেয়ার সেন্টার, তথ্য আপা, জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স, কম্পিউটার ট্রেইনিং সেন্টার, ক্ষুদ্য ও হস্তশিল্প, জয়ীতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে এসব কর্মসূচি ও সেবামূলক কাজের ফলে দেশের আবদ্ধমান নারীরা ঘরের বাইরে এসে নিজেদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে, কিছু অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাচ্ছে। সবকিছুই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বদৌলতে পরিচালিত হচ্ছে যার পথচলা শুরু হয়েছিল জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। বলা হয়ে থাকে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা যে হারে লক্ষ্যণীয় সে হারে সরকারী পর্যায়ে কোন পদক্ষেপ দৃশ্যায়ন দেখা যায় না। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়য়ের অধীনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থায়নে সরকারি পর্যায়ে নারী উন্নয়নের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভূমিকার উপর সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী। তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাংগঠনটির

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিক, কাঠামোগত ও পারিপার্শ্বিক দূর্বলতাকে চিহ্নিত করে জাতীয় পর্যায়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাতে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করাই গবেষণাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গবেষণাটির অধ্যায়গুলো থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সাংবিধানিক অধিকার ও নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুসারে নারীরা তাদের অধিকারগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিশ্চিত করতে পারছেনা। কারণ বাংলাদেশের সরকারী সহায়তার চেয়ে বেসরকারী সহায়তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। গ্রামীণ সমাজে নারীরা ব্রাক, আশা থেকে যে পরিমাণ ঋণ নিয়ে নিজেদের জীবিকা সরবরাহ করছে, সরকারী সহায়তায় ততোটা জীবিকা সরবরাহ করতে পারছেনা। কারণ সরকার শুধুমাত্র গরীব, অসহায় বয়স্ক নারী, প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে, মুক্তিযোদ্ধ্যাদের সহায়তা দিয়ে থাকে। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা এসব সহযোগিতা না পেয়ে বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার কর্মসূচির মাধ্যমে সামান্য কিছু নারী উন্নয়ন ঘটলেও আপামর জনগণের জন্য তা নিতান্তই নগন্য। তবে অতীতের তুলনায় নারীরা এগিয়ে যে যাচ্ছে সেটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ মহিলা সংস্থার এসব কর্মসূচির সাথে বেসরকারী সংস্থাও কিছুটা এগিয়ে আসছে, যার ফলে দেশে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আগের থেকে উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। এই গবেষণা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত নারীদের অবস্থান বর্তমান সমাজে অনেকটা উন্নত হয়েছে। যে নারীরা ঘরে বসে কাঁথা শেলাই করতো অথবা সন্তান উৎপাদনকেই যারা মূখ্য কাজ ভেবে নিতো, সেই নারীরাই আজ ঘরের বাইরে এসে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের উন্নত করে উন্নয়নের উচ্চতর শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। সকল সংস্থা ও সংগঠনের মধ্য থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সংগঠন "বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা" একমাত্র নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, নারীর অগ্রসর জীবনের জন্য বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন দেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography

Bacher, H. (1980), *Women and Media*, London: Polytechnic of Central London

Chakravarty, Renu (1980), "Panama Jothings-Report on Women and Media Conference." In *Mainstream,* Vol.19, No. 46, p 28

Chabra, Rami (1980), "Women and the Media: A Feminist View Point." In *Daily Indian Express*……date

Desai, Neera.(1983), "Indian Womwn and Media." In *Mumbai Research Unit on Development Studies,* Mumbai: SNDT Women's University

Despande, Anjali (1983), "Women and TV" In *Mainstream* Vol. 21, No. 51

Drive against media abuse of women. (The Times of India, 4 February 1983)

Essdee. Sex in AD. (*The Economic Times Sunday*, 28 August 1983)

Exposed: Protest against the use of scantily clad feminine figures in advertisements. *(The* time of India, 4 June 1971)

Haskell Molly. (1974). *From Reverence Trape: the Treatment of Women in the Movies*. New York, Pengrin.

H. S. Women are not for sale. (*The Sunday Statesman, 23 October 1983)*

In defence of womankind. (*Patriot, 29 May 1983)*

Kalhan, Promilla. (1983). Women in films. *The Hindustan Times*.

Kapoor, Nina (1983). Sex in films. *The Indian express.*

Majumder, Modhumita. (1983). Women and Media. *Mainstream,* Vol. 21, No. 51.

Media and Women (Ed.) The Hindustan Times, 4 January 1983, p. 9

Plea for Banning Sex Violence in Films. (The times of India, 21 September 1983)

Plea to Stop Indecent Portrayal of Women. (The times of India, 11 September 1983)

Dhaka University Institutional Repository

Raina, Divya. How Fair in Print. *(*The Hindustan Times Sunday Magazine, 26 December 1982)

Raman, Papri. (1980). Women and the media. *Patriot.*

Scissors for Servile Women Scenes. *The Hindustan Times*, 8 May 1983)

Sen Gupta, Subhrata. (1983). *The New Bharatiya Nari is Here*. (The Statesman Sunday Special, 31 July 1983)

Srinivasan, K. S. Advertising and Women. (Vidura, Vol. 17, no. 3, June 1980)

TV Mimics Cinema anti-feminism. (The Statesman Sunday Special, 14 August 1983)

Usha, Rao, N. J. *Political Participation and Awareness among Rural Women of Chikmaglur: A Study of Belthangadi and Chikmaglur Taluks.* (Monthly Public Opinion Survey, Vol. 25, No. 1)

Verma, J. C. (1978). Women in rural Economy. *Kurukshetra,* Vol. 26, No. 11.

Barbara, j. Nelson and Najma Chowdhury. Women and politics worldwide, Yale University, London, 1994

Ahmed, A. B. Sharfuddin. (1983). Bizna: A Study of Power Structure in Contemporary Rural Bangladesh. *Bangladesh Books International Ltd*. Dhaka.

Mackinon, Catharine A.(1991). Toward a Feminist Theory of the State, *Harvard University Press*, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Qdir, Sayeda Rawshan and Islam, Mahmuda. (1987). Women Representatives at the Union Level as Change Agent of Development, *Women for Women*, Dhaka.

August, Bebel, (1987). Women in the Past present and future. Germany.

Davidson. N and Margaret C.(1985). The United Nations and Decision Making: The Role of Women. *United Nations Institute*.

Southard, Barba (1996). The Woman's Movement and Colonial Politics, *The University Press Limited.*

সুফিয়া কামাল (১৯৮৮), *একাত্তরের ডায়রি*, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ফাল্গুনী, অদিতি (১৯৯৭)। *বাংলার নারী সংগ্রামীঃ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান,* স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।

বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী (২০০০)। *নারী শ্রেণী ও বর্ণঃ নিম্নবর্নের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান,* ম্যানিস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বেগ, মালেকা ও সৈয়দ আজিজুল হক (২০০১)। *আমি নারী।* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিমটেড, ঢাকা।

বেগম, মালেকা (২০০১)। *একাত্তরের নারী।* মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

বেগম, মালেকা (১৯৯৭)। *নারী মুক্তি আন্দোলন।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মু, আনু (১৯৯৭)। *নারী, পুরুষ ও সমাজ।* সন্দেশ, ঢাকা।

হক, মাহমুদ শামসুল (২০০০)। *বাঙ্গালী নারীঃ হাজার বছরের বাংলা নারী,* পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

নারী জাগরণের শত বছর (২০০০)। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, আহবাহক, নাজমা চৌধুরী, টাস্ক ফোরস প্রতিবেদন, সাহত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯১।

চৌধুরী , ড. নাজমা সম্পাদিত (১৯৯১), নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন।

চৌধুরী , ড. নাজমা (১৯৯১)। উইমেন ইন পইলিটিক্স।

মার্ক্স, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক (১৯৮৩)। কমিউনিস্ট মেনিফেসটোঃ অনুবাদ-গনেন্দ্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়। পার্ল পাবলিকেশন। কলকাতা।

অগাস্ট বেবেল (১৯৮৩)। *নারীঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।*

মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন, বাঙ্গালী নারীঃ হাজার বছরের বাঙ্গালী নারী।*

Dhaka University Institutional Repository

গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া(১৯৯০), নারীঃ রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঠাকুর, আব্দুল হান্নান (১৯৮৫), নির্বাচন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

তথ্যসূত্রঃ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল জরিপ।